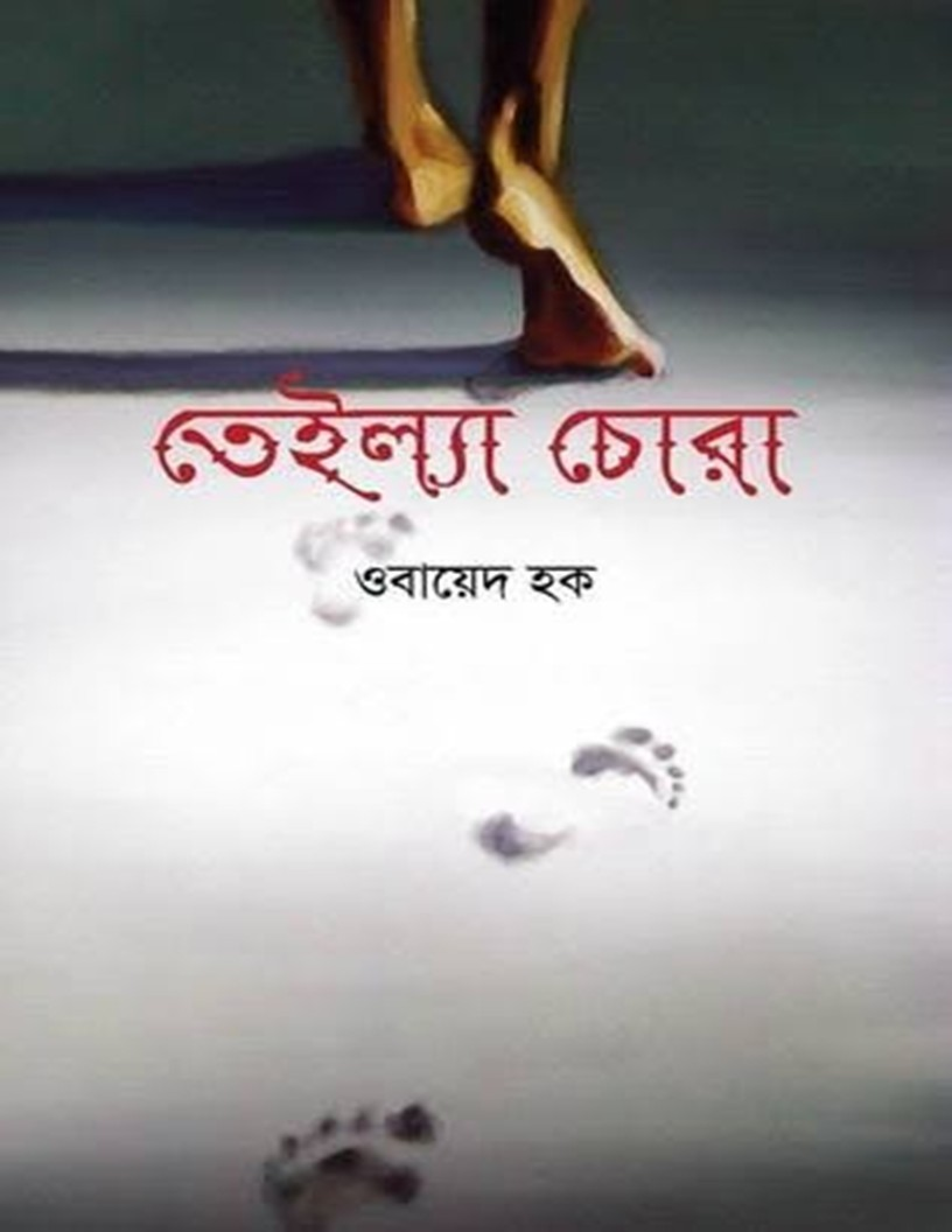

তেইল্যা চোরা
ওবায়েদ হক

আবেদন

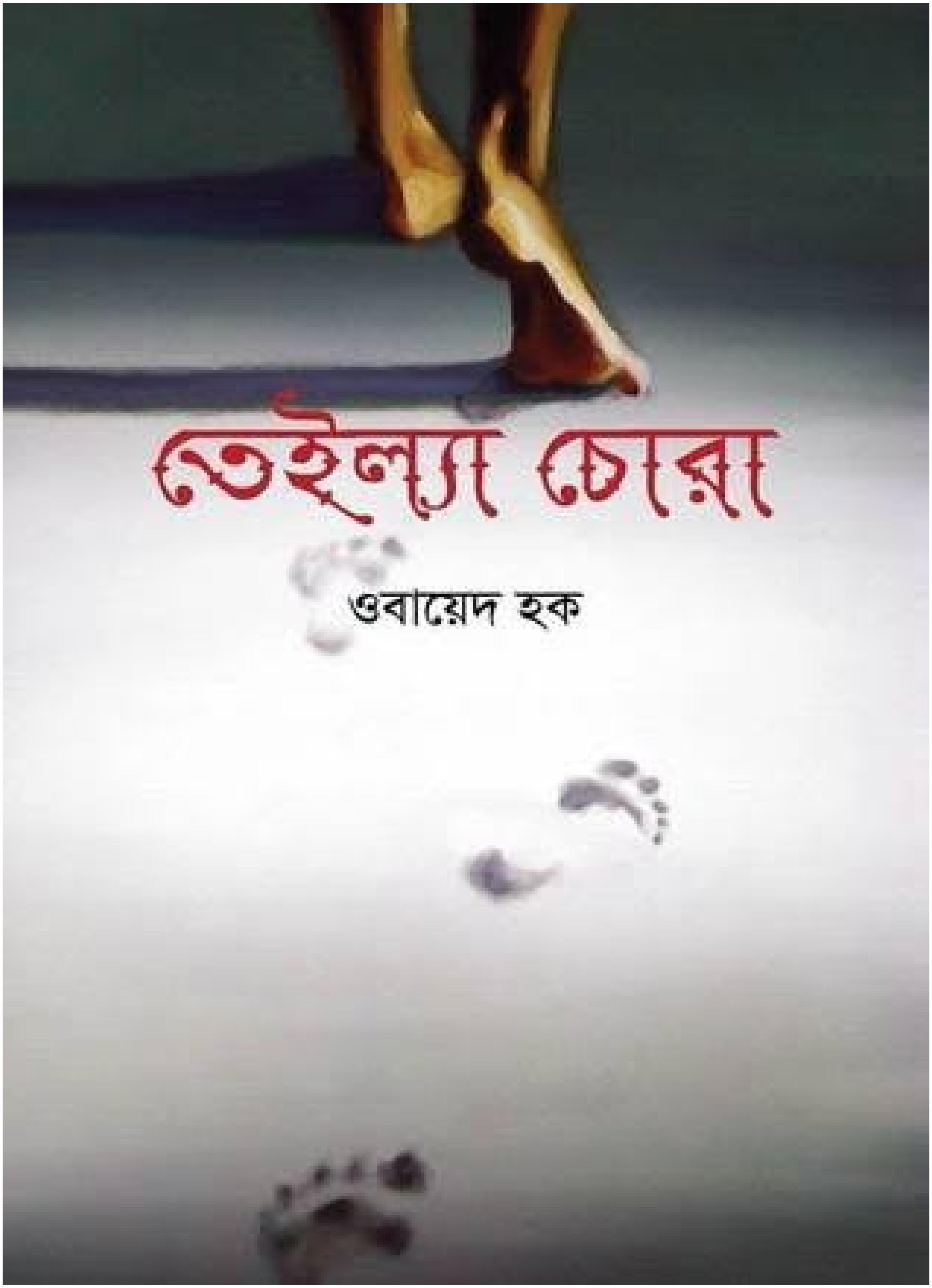
নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।


তেইল্যা চোরা
ওবায়েদ হক

তেইল্যা চোরা

ওবায়েদ হক

বিদ্যানন্দ প্রকাশনী

প্রচ্ছদঃ- মেজর এমরান

উৎসর্গ

বংশাল এলাকার সন্ত্রাসী নাদির গুন্ডা, এলাকার মানুষ তাকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। আড়ালে গিয়ে গালি দেয়, অভিশাপ দেয়। ভালো ছেলেরা তার সাথে মেশে না, অভিভাবকরা নিষেধ করেছেন। কিন্তু যখন এই এলাকার মানুষের ওপর যমদূতের মতো পাকিস্তানি হানাদাররা আক্রমণ করল, তখন এই নাদির গুন্ডাই পুলিশ ফাঁড়িতে হাজির হয়েছিল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। ভয়ে দরজায় খিল দিয়ে সবাই যখন কাঁপছে এই নাদির গুন্ডাই মেশিনগান দিয়ে গুলির বর্ষণ করছিল পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি পাকিস্তানিরা, পিঠটান দিয়েছিল। সবাই তখন বলাবলি করছিল, নাদিরের মতো আরও কয়েকটা ছেলে থাকলে পাকিস্তানিরা পাত্তাই পেত না।

পাকিস্তানিদের ভয়ে রেশনের দোকান তখন বন্ধই থাকতো, এলাকার মানুষ না খেয়ে দিনযাপন করছে। তখন এই নাদিরই দোকান ভেঙে সবার ঘরে রেশন পৌঁছে দিলো। অভিশাপ দেওয়া মায়েরাও হাত তুলে দোয়া করেছিল নাদির গুন্ডার জন্য।

নাদির ধরা পড়ল এপ্রিলের শেষভাগে, পাকিস্তানি দালাল গ্যাদা গুন্ডা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, নয়তো মাথামোটা পাকিস্তানিদের সাধ্য ছিল না তাঁকে খুঁজে বের করে। তারপর তাঁকে আর কখনও দেখা যায়নি।

নাদির গুন্ডার মতো এরকম অজস্র ছেলে যারা সমাজের চক্ষুশূল ছিল, তাঁরাই সবচেয়ে আগে নির্ভয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, তারাই বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে ধরেছিল, তাঁর বুক পার হয়ে যাতে গুলিটা দেশের মানুষের গায়ে না লাগে। তাঁরা হয়তো সমাজের মান বাঁচানো ছেলে ছিল না, তাঁরা সমাজের প্রাণ বাঁচানো ছেলে।

নাদির গুন্ডা এবং তাঁর মতো হাজার হাজার বুকে গুলি খাওয়া অবাধ্য সন্তানদের এই বইটি গর্বের সাথে উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের অন্তত সাত কোটি গল্প আছে। বিচিত্র, বিভীষিকাময়, অভিনব সব গল্প, যুদ্ধ হচ্ছে গল্পের খনি। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মুক্তিযুদ্ধ দেখার চোখ ভিন্ন। সকল দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলনেই যুদ্ধের চিত্রটা সামগ্রিক হয় কিন্তু ইতিহাস একচোখা। তাই মুক্তিযুদ্ধের পুরো চিত্রটি দেখাতে প্রয়োজন হয় গল্পের। ইতিহাসে বঞ্চিত নিচু শ্রেণির এক চোর এবং তার পরিবারের মুক্তিযুদ্ধ দেখার গল্প হচ্ছে 'তেইল্যা চোরা'।

'তেইল্যা চোরা বহুদিন পাঠকের নাগালের বাহিরে ছিল। কত বই হারিয়ে যায়, গুটিকয়েক পাঠকের বুক শেলফে নীরবে পড়ে থাকে। এই উপন্যাসটির ভাগ্যেও হয়তো তেমন কিছুই ঘটত। বিদ্যানন্দ পুনঃপ্রকাশ করে মুমূর্ষ বইটিকে বাঁচিয়ে তুলেছে, তাদের ধন্যবাদ আর কামনা করি পাঠকের মনে উপন্যাসটির আয়ুবৃদ্ধি হোক।

-ওবায়েদ হক

২৯/০৪/২০১৭

১

বলরামপুর গ্রামে মোল্লা বাড়ির অর্ধেকটা জুড়ে ফজর আলীর বাস। তার বাপ-দাদার জন্ম এখানে নয়। বছর চল্লিশেক আগে ফজর আলীর বাবা কসর আলী নিজ গ্রাম বালিয়াকান্দি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। নিজ গ্রামে তার পদবী লোকে ঠিক সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। কালো অন্ধকারের মতো দেহ আর তার পেশা এই দুয়ে মিলে তার পদবী হয়েছিল ‘কাইল্যা চোরা'। অধিক ব্যবহারের কারণে পরে তা তার আসল নামকে গ্রাস করে, ‘কসর আলী’ বিলুপ্ত হয়।

গায়ের রঙের কারণেই হোক আর চতুরতার কারণেই হোক নিজ পেশায় ‘কাইল্যা চোরা ছিল দিগ্বিজয়ী। গ্রাম গ্রামান্তরে তার সুনাম কিংবা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আশেপাশের দশগ্রাম এক নামে ‘কাইল্যা চোরা'-কে চিনত। গ্রামের মাতব্বর দিনরাত লোক খাইয়েও এত নাম করতে পারেনি, তার হিংসা হতেই পারে। কয়েকটা তালুকের মালিক সে, ব্রিটিশসাহেবদের সাথে উঠাবসা অথচ মানুষকে গ্রামের নাম বললে তারা কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করে, “ও কাইল্যা চোরার গ্রাম”।

কাইল্যা চোরাকে মাথা মুড়িয়ে আলকাতরা মেখে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে নিজের এবং গ্রামের সম্মান রক্ষা করলেন তিনি। নিজ গ্রাম ছেড়ে ‘কাইল্যা চোরা' বলরামপুরে চলে আসে। অভাবে পড়া হাসমত মোল্লার ছাড়া বাড়ির অর্ধেকটা কিনে নিয়ে বসত শুরু করে। নিজের নাম ফিরে পায় সে। কিন্তু বেশিদিন নিজ নামে স্থায়ী হতে পারেনি। তার সুনাম, তার পদবী তাকে অনুসরণ করে এই বলরামপুরেও চলে এসেছিল। কিন্তু তাকে তাড়ানোর মতো তালুকদার বলরামপুরে ছিল না।

হিন্দুস্তান-পাকিস্তান আলাদা হলো, সাদাসাহেবরা দেশ ছাড়লো কিন্তু কসর আলী নিজের পেশা ছাড়লো না। নিজ পেশাতে বহাল থেকেই তিন মেয়ের বিয়ে দিলো। পাত্র ভালো পেয়েছিল, মর্যাদায় তার থেকে উচ্চ, ডাকাত। ফজর আলী তখনও মাঠে ময়দানে খেলা করে বেড়ায়। গাছে ঢিল মারে, পুকুরের পানি ঘোলা করে। বয়স তার খুব একটা বেশি হয়নি, কৈশোরের মাঝামাঝি। কসর আলী ভাবল, তিন মেয়ের ব্যবস্থা হলো, ছেলের

একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পারলে তার সুখমৃত্যু হবে না। ছেলেকে নিজের বিদ্যা ছাড়া আর কিইবা দিতে পারতো সে, তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে অর্থসম্পত্তি এবং বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই লোপ পেয়েছিল। ফজরের মা দাওয়ায় বসে কাঁদতে শুরু করলো। কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বলল, 'আমার পোলাডারে চোর বানাইও না।'

কসর আলী সিঁদ কাটা শাবলটাকে ধার দিতে দিতে বলল, ‘চোরের পোলা চোর হইবো, জজ ব্যারিস্টার হইত না। আমি মইরা গেলে পোলায় কী কইরা খাইবো, চোরের পোলারে কাম দিবো কেডা? জমি জিরাত থাকলে চাষবাস কইরা খাইতো, মাইয়া বিয়া দিতে তো সবই গেল ঐ ডাকাইতের ব্যাটাগো পেটে।

এসব যুক্তিতেও চোরপত্নীর মন বুঝে না। সে কেঁদেই যায়, কসর আলী শাবল ধার করায় মন দেয়। নারীর অশ্রু আর চুলার ছাই তার কাছে একই বস্তু।

কসর আলীর দীর্ঘ কর্মজীবনে কখনো ধরা পড়েনি সে, সিদ কেটেছে নিঃশব্দে, আত্মবিশ্বাস বরাবরই তার তুঙ্গে। কিন্তু নিজের ছেলেকে নিয়ে যখন সিঁদ কাটছে, কেন যেন হাতটা বারবার কেঁপে উঠছিল, আজ তো সে আফিমও খায়নি। মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ টিনে আঘাত করলো কসর, ভেতর থেকে খেকিয়ে উঠলো কয়েকটা পুরুষ কণ্ঠ। জীবনে এই প্রথম ভয়ে পেট মুচড়ে উঠলো কাইল্যা চোরার। শাবল ফেলে দৌড়ে পালানোর আগেই ধরা খেলো, ফজর কোনোরকমে পালিয়েছে। | কাইল্যা চোরার হাতেনাতে ধরা খাওয়ার খবরটা আগুনের মতো রটে গেল। হাতে শান দিয়ে আশেপাশের গেরাম থেকে লোকজন এলো। যাদের দ্রব্য সামগ্রী চুরি গিয়েছিল তারা এসেছে কিল-ঘুষিতে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে। কিল-ঘুষি দানে কেউ কার্পণ্য করেনি। দুপুর

নাগাদ ফজর আর তার মা সেখানে পৌছালো। ফিসফাস শব্দে সবাই মা ছেলেকে ‘চোরের বউ’ ‘চোরের পুত' সম্ভাষণ করে অভ্যর্থনা জানানো হলো। কসরের দেহে তখন অল্প একটু প্রাণ অবশিষ্ট আছে। যারা ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে তারা ফজর আর তার মাকে দেখে আবার উৎসাহ ফিরে পেলো। আরো এক দফা কাইল্যা চোরার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তারা এবার লাভ তুলে নিলো। লাভক্ষতির হিসাবের মধ্যেই কোনো এক সময় কাইল্যা চোরের প্রাণ বেরিয়ে গেল।

মোল্লা মৌলভীরা কাইল্যা চোরার জানাজা পড়িয়ে জনগণের বিরাগ আয় করতে চান না। ঘরের পাশে তালপাতার বেড়ার ওপাড়েই মোল্লা বাড়ি, স্বয়ং হাসমত মোল্লা উপস্থিত সেখানে কিন্তু বেড়ার এপাড়ে এসে সদ্য প্রয়াত চোরের জানাজা পড়ানোর সাহস তার হলো না। ফজর আলী বাল্যকালে শেখা যত সুরা সব পড়ে নিজের বাবাকে টেনে কবরে নামালো। নীরবে কাঁদছে তার মা, বিলাপ করার মতো বিলাসিতা এই মৃত্যুতে নেই, প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দেবে না, কেঁদে কেঁদে মূর্ছা গেলে মাথায় তেল পানি মাখবে না। কসর আলী চিৎকার করে পৃথিবীতে এসেছিল আর কাইল্যা চোরা নীরবে প্রস্থান করলো।

২

রাত খুব বেশি হয়নি, কিন্তু অমাবস্যা হওয়ার কারণে মনে হচ্ছে অনেক রাত। আকাশ কুঁড়ে কুঁড়ে তারা জ্বলছে। ঝিঁঝিঁরা অবিরত ডেকে রাতটাকে করে দিয়েছে আরো গভীর। ফজর দাওয়ায় বসে গায়ে সরিষার তেল মাখছে। ফজরের ছেলে মজিদ ঘুমাচ্ছে, কিন্তু আমেনার চোখে ঘুম নেই, সে আজ ঘুমাতে পারবে না। এরকম অনেক রাত সে জেগে কাটিয়েছে, বিয়ের আগে তার বাবার জন্য আর বিয়ের পর স্বামীর জন্য।

আমেনা বিছানা ছেড়ে স্বামীর পাশে এসে বসে। ফজর তেল মাখতে মাখতেই বলে, 'কিছু কইবা?' আমেনা চুপ করে বসে মাথা নাড়ে। কিছু বলে না সে, বলতে পারে। ফজর ঠিক জানে আমেনা কী বলতে চায়। তেল মাখতে মাখতেই পূর্বপাশের কদম গাছ দুটির দিকে নজর গেল তার। কদম গাছ দুটির নিচেই তার বাবা এবং মায়ের কবর। কসর আলী মারা যাবার পর ফজরের মা তাকে আমেনার না বলা কথাগুলোই বলেছিল, 'বাপ আমার, তুই যাইস না এই কামে। তোর বাপে করছে, দুনিয়ায় মানুষ গাইল্যাইছে, কবরে আরো আজাব ভোগ করতাছে। ক্ষেতে কামলা যা, মাডি কাট। আমি মাচাত লাউ লাগাইছি, কুমড়া লাগামু, আমাগো দুইজনের সংসার চইল্যা যাইবো। এই পাপের কাম করিস না বাপ, দোহাই লাগে।'

কিন্তু তাদের পাপের জীবন। মানুষ তাদের পাপ মনে করিয়ে দিতে কোনো কার্পণ্য করেনি। চোরের ছেলেকে কাজ দেয়ার মতো নির্বুদ্ধিতাও কেউ করেনি উল্টো ভূঁইয়াসাহেব কান মলে দিলেন, মিঞাসাহেব পিঠ চাবকে দিলেন। লাউয়ের মাচায় লাউ ধরে, ঘরে থেকে তা পঁচে যায়, কুমড়োগুলো ইঁদুরে খায় কিন্তু কেউ কিনে না। পেটে যখন জ্বালা শুরু হয়, তখন আর কবরের আজাবের কথা মনে থাকে না। ছেড়া কাপড়ে পর্দা করা যায় না। ভাঙা ঘরে শুয়ে পুণ্যের চিন্তা আসে না।

ভূইয়া-মিঞারা শুনলে অবাক হবে, রেগে যাবে। গলা খেকিয়ে বলবে, আমি বলেছি চুরি করতে?' কিন্তু দায়টা তাদেরই। কসর আলী চোরের জন্ম দেয়নি, দিয়েছে এই ভূইয়া-মিঞাদের মতো ভদ্র মানুষেরা। একদিন রাতে ফজর বেরিয়ে গেল। সারারাত তার মা নিঘুম

কাটালো। ফজর সকালে ফিরে এলো। হাতে নতুন পাটের শাড়ি, মাথায় বাঁশের ওড়া থেকে বড়ো মাছের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সাথে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী উঁকিঝুকি মারছে। খাদ্য-বস্ত্রের উৎস সম্পর্কে ফজরের মা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, সেই ক্ষমতা তার ছিল না। ফজরের বউ আমেনাও এখন কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

ফজরের গা'টা ঘুটঘুটে অন্ধকারেও চকচক করছে। লুঙ্গিটা কাছা মেরে পায়েও তেল লাগালো সে। একটা কাপড়ের ঝোলা আর শাবলটা হাতে নিয়ে বাড়ির পূর্বদিকে কদম গাছগুলো পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যাওয়ার আগে গাছ দুটিকে একবার দেখে নিলো, এই কদম গাছ দুটোকে খুব বিষন্ন দেখায় সবসময়, এমনকি ফুল ফুটলেও।

***

বাড়িটা এক দফা জরিপ করে নিলো ফজর আলী। বেড়া দিয়ে ঘেরা দোচালা ঘর। তার পাশে গোয়াল ঘর আর রসুই ঘর। ঘরের পাশে গিয়ে কান পাতলো সে, ফিসফাস শব্দ শোনা যাচ্ছে। কদম হোসেনের ঘর এটা, তার ছেলের বিয়ে দিয়েছে কিছুদিন আগে। নতুন বিয়ে করা ছেলেরা রাতে সহজে ঘুমাতে চায় না, কিশোরীদের মতো ফিসফিস করে কথা বলে বউয়ের সাথে। ফজর আলী মনে মনে বলল, 'ঘুমা শালা ঘুমা, রং-রসের কতা কাইল কইস।' কিন্তু কদম হোসেনের ছেলে ফজরের মনের কথা শুনলো না, সে তার বউয়ের মন বুঝতেই ব্যস্ত। ফজর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। এই পেশায় ধৈর্য্যই সবচেয়ে বড়ো শক্তি। ফিসফাস করে কথা বললেও রাতের নীরবতার কারণে সবই শুনছে ফজর। কদমের ছেলে বলছে,

'বিয়ার দিন এত কানছিলা কেন, আমারে পছন্দ হয় নাই?

'তোমার মতো দাঁতলা বেড়ারে কার পছন্দ হইবো?"

'দাঁতের দেখছো কী! কামড় দিলে বুঝবা।

'হেই দুঃখেই তো কানছিলাম।

বলেই ফিক ফিক করে হেসে উঠলো। সেই হাসিতে কদম হোসেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে বার কয়েক কৃত্রিম গলা খাঁকারি দিলো। ফিসফিসানিও বন্ধ হয়ে গেল।

ফজরের আমেনার কথা মনে হলো, বিয়ের দিন একটুও কাঁদেনি সে। সবাই ছিঃ ছিঃ করলো। বলল, চোরের মাইয়্যার দিল বহুত পাষাণ।

আশ্চর্য হয়ে ফজর ভাবলো, সে কোনোদিন আমেনাকে কাঁদতে দেখেনি। তার চোখে সবসময়ই একটা বেদনা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তা সে বুকের মধ্যেই জমিয়ে রাখে, চোখ ফেটে কোনোদিন বের হয় না সেগুলো। বিয়ের রাতে গম্ভীর মুখে গুটি মেরে শুয়ে ছিল আমেনা। নতুন বউয়ের স্বভাব সুলভ ভীতি তার চোখে ছিল না। ফজর তাকে ডাকতেই সে উঠে বসেছিল। ফজর কে হতবাক করে দিয়ে বলেছিল, 'ডাকেন ক্যান, কাপড় খুলবেন?

***

কদম হোসেন এবং তার ছেলে একযোগে নাকডাকা শুরু করলো। ফজরের কাছে নাক ডাকার শব্দের চেয়ে মধুর শব্দ আর কিছু নেই। শাবল দিয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করলো সে। খুব বেশি সময় লাগেনি মাটি খুঁড়ে ঘরের মধ্যে সংযোগ করতে। ঘরের ভেতরের অন্ধকারের সাথে চোখগুলোকে ধাতস্থ করতে একটু সময় নিলো সে। বেড়ালের মতো পা ফেলে নতুন বরের যৌতুক সামগ্রী খুঁজতে লাগলো। পিতলের কলসি, সিলভারের জগ, পিকদানির মতো কিছু ধাতব সামগ্রী খুঁজে পেলো, এগুলো বহন করা ভীষণ মুশকিল। এসব নিম্নবিত্ত ঘরে এর অতিরিক্ত কিছু খুঁজেও পাওয়া যায় না। যাদের ঘরে সোনাদানা আছে তাদের ভিটে ইট দিয়ে পাকা করা, তাদের ঘরে সিঁদ কাটা যায় না। পুরো ঘর জুড়ে নগদ টাকার কোনো সন্ধান পেলো না সে। কদম হোসেন হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে, বাঁশের চৌকির একপ্রান্তে তার কঙ্কালসাড় রুগ্ন বউটি কোনোরকমে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। কদম হোসেন এই বউটির মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে, তাহলে আরেকটি জোয়ান মেয়ে দেখে বিয়ে করে কিছু নগদ অর্থের আমদানী করবে, সাথে জোয়ান শরীরকে ভালোই খাটিয়ে নিতে পারবে। এই বউয়ের সাথে আসা অর্থ অনেক আগেই শেষ, শরীরের শক্তিও ফুড়িয়ে এসেছে। তিন ডেকচি ধান সিদ্ধ করতেই হাঁপিয়ে উঠে। গতরের শক্তি কমার সাথে সাথে বউয়ের কদরও কমে গেছে। তিনবেলা খাবার দিয়ে এর আয়ু বৃদ্ধি করতে চায় না কদম, তাইতো বউটির এমন কঙ্কাল দশা।

ফজর আলী কদমের ঘরে তেমন কিছুই পেলো না, এসব ঘরে টাকা-পয়সা সাধারণত গোলায় রাখা হয়। ফজর গোলায় উঁকি দিয়ে দেখলো, ধান একেবারে তলানীতে। কিন্তু একটি ছোটো কাঠের বাক্স দেখা যাচ্ছে। ফজর আলী গোলায় নেমে বাক্সটি খুলে হাবিজাবি কিছু কাগজ পেলো, কিছু পিতলের চুড়ি ছিল, সেগুলোর তেমন দাম পাওয়া যাবে না। একেবারে শেষে কিছু মলিন টাকা পাওয়া গেল। অন্ধকারেও গুনে ফেলল ফজর, পনেরো টাকা বারো আনা। তাই নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কদমের পুত্র বধুর গলায় রূপার একটা হার চোখে পড়ল। নিজের বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সন্তর্পনে হারটা গলা থেকে খুলে নিলো। বেশ ভারী আছে, দুই ভরি তো হবেই। কলিম বেপারীর কাছে এই হারের জন্য বারো টাকা দাম হাঁকবে, চিন্তা করলো ফজর। হারটি একটু কাছে থেকে দেখতেই বুঝলো, রূপার হার বটে তবে অনেক পুরনো। বিয়ের সময় মেয়ের মা নিশ্চয় বাক্স থেকে খুলে দিয়েছে। তার আগেও তার মা হয়তো তাকে দিয়েছে চোখের জলে ভিজিয়ে। কত নারীর চোখের জল আর মমতা আছে এই পুরনো হারে। চোরদের এসব ভাবলে হয় না, কিন্তু ফজর কিছুতেই হারটা নিয়ে তার ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ গলে বেরিয়ে যেতে পারলো না। সে হারটা আবার মেয়েটির গলায় দিতে গেল। খুলে নেয়া বিদ্যায় ফজর আলী যত শিক্ষিত, পরিয়ে দেয়াতে ততটাই মূখ। হার ফেরত দিতে গিয়ে নতুন বধুর ঘুমই গেল ভেঙ্গে।

সাক্ষাত যমকে কিংবা তেলাপোকা দেখেও কোনো মেয়ে এত জোরে চিৎকার দিতো না, যতটা ফজর আলীকে দেখে কদম হোসেনের ছেলের বউ দিলো। কদম হোসেনের ছেলে আর কিছু পারুক আর না পারুক, ঘুমাতে পারে। যেই চিৎকারে নদীর পাড়ে কবরস্থান থেকে দুতিনটা মুর্দাও সম্ভবত জেগে উঠেছে, সে চিৎকারে তার ঘুমের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটলো না। কিন্তু কদম হোসেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিজের পুত্রকে গালি দিয়েই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো, তার ধারনা তার পুৎৰই কোনো কাণ্ড করেছে। কিন্তু এ ঘরে এসে বধুর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো তেলত্যালে একটা শরীর ঘরের মেঝেতে অর্ধেক গলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি করে করে সে লাফ দিয়ে ফজর আলীর পা চেপে ধরে চেঁচাতে লাগলো। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হলো না, ফজর আলী পিছলে বেরিয়ে গেল। কদম হোসেন তখনো চেঁচিয়ে যাচ্ছে, তেইল্যা চোরা, তেইল্যা চোরা।

আশেপাশের মানুষজন চুলায় হাত ঢুকিয়ে হাতে ছাই মেখে এলো তেইল্যা চোরাকে ধরার জন্য। কিন্তু দৌড়ে পালানোতে তেইল্যা চোরা তার বাবা কাইল্যা চোরাকেও হার মানিয়েছিল। মুহূর্তেই সে গায়েব হয়ে গেল।

সকাল হতে হতেই কদম হোসেনের চুরি যাওয়া সম্পদের পরিমাণ বাড়তে লাগলো। পনেরো টাকা বারো আনা হয়ে গেল পঁচাত্তর টাকা। যেই রূপার হার পুত্রবধুর গলায় ছিল এবং এখনো আছে তা হয়ে গেল সোনার হার এবং তাও চুরি হলো। ডজন খানেক কাসার বাসন কোসন, এক হালি পিতলের কলস মিলিয়ে তার বিশাল সম্পত্তি চুরি হয়ে গেছে। চুরি যাওয়া বস্তুর যে ফিরিস্তি সে দিচ্ছিলো তা শুনে জমিদার বাবুও মুখ লুকাবেন। কদম হোসেনের কঙ্কালসাড় বউ খুব কাজে এলো, শরীরে কিছু থাক না থাক তার গলার ধারেকাছেও কেউ নেই। স্বামীর বর্ণিত সম্পদের সাথে আরো কিছু যোগ করে গলা উঁচিয়ে মাটিতে আছড়ে আছড়ে বিলাপ করছিল সে। পুত্র হারানোর শোকেও কেউ এমন বিলাপ করতে পারে না।

***

আমেনা ধুলো উড়িয়ে উঠান ঝাড় দিচ্ছে। ফজরের সাড়ে চার বছরের ছেলে মজিদ হাঁস-মুরগীদের দৌড়িয়ে বাড়ি ছাড়া করে এখন ছোট্ট পেয়ারা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। ফজর আলী দাওয়ায় বসে আছে অপেক্ষায়। তেল আর কলঙ্ক সবই পুকুরের জলে ধুয়ে শেষ রাতেই বাড়ি ফিরেছিল সে। সারা রাত জেগে থাকার পর সকালে পান্তা খেয়ে শরীরে বেশ ঝিমুনি ধরে গেছে। কিন্তু এখন ঘুমানো যাবে না।

অতি কুৎসিত গালি দিতে দিতে মোল্লা বাড়ি কিংবা চোর বাড়িতে ঢুকলো কদম হোসেন। ফজর এতক্ষণ তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। কদমের সাথে তার বৌ কামড়ানোর অভিপ্রায় রাখা দাঁতাল ছেলেটি, এবং আরো জনা পাঁচেক লোক এসেছে। উঠানে দাঁড়িয়ে ফজর আলীর দিকে তাকিয়ে কদম হোসেন বলল, “শালার পুত, আমার জিনিসপাতি সব বাইর কইরা দে, নাইলে লাথি দিয়া বিচি গাইলা দিমু।'

এরকম সকালের সাথে আমেনা পরিচিত, সে আপনমনে রান্নাঘরে চলে গেল চুলা ধরাতে। মজিদ একটু ভয় পেয়েছে, সে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে তার মায়ের আঁচলে লুকালো। ফজর খুব অবাক হয়ে বলল, 'কিয়ের কতা কন কদম ভাই? কিয়ের জিনিসপাতি?'

দাতাল ছেলেটি বলে উঠলো, "শালা তেইল্যা চোরা, ঢঙ করস? কাইলকা রাইতে আমাগো বাইত যাস নাই চুরি করতে?

ফজর তার মুখভঙ্গি পরিবর্তন না করে বলল, 'কসম, আমি রাইতে বাইত আছিলাম।'

পেছনের লোকগুলোর মধ্যে একজন বলে উঠলো, "তেইল্যা চোরার ঘরে ঢুইক্যা দেখো না, জিনিসপাতি পাও কিনা।

সমস্বরে বাকিরা সম্মতি জানালো, কিন্তু কদম হোসেনের সেরকম ইচ্ছা ছিল না। সে জানে তার পনেরো টাকা বারো আনা ছাড়া আর কিছুই চুরি হয়নি। কিন্তু পাশের লোকদের অতি উৎসাহে সে ঘর থেকে একবার ঘুরে এলো, পুরনো কলসি, আর কাপড় চোপড় উল্টিয়ে বেরিয়ে এলো। বাহিরে এসেই বলল, 'চুরির জিনিস কেউ ঘরে রাখে নাকি? কই বেচসে কে জানে?

একজন বলে উঠলো, "তার বউরে জিগাও। কদম হোসেন বিরক্ত হয়ে বলল, "ধুর মিয়ারা তোমরা কুনো কামের, চোরের বউ কি হাচা কতা কইবো নাকি?

ফজর আলীর দিকে তাকিয়ে আরো ভয়ানক কুৎসিত কয়েকটা গালিসহ হুমকি দিয়ে কদম হোসেন চলে গেল। ফজর আলী এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল।

কদম হোসেন ভুল বলেছিল, আমেনা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। যদি সত্য বলতে না পারে তবে চুপ করে থাকে তবে মিথ্যা বলে না। চোরের মেয়ে, চোরের বউ হিসেবে এই দোষটি তার ছিল। তবে একটি গুণও ছিল, সব গঞ্জনা, অপমান প্রতিবাদহীনভাবে গ্রহণ করতো। গঞ্জনায় যদি পেট ভরতো তবে আমেনাকে কখনো অনাহারী থাকতে হতো না।

চুরির দ্রব্যাদি না পেয়ে কদম গজরাতে গজরাতে চলে গেল। কিন্তু গালির কোটা তখনও পূরণ হয়নি, মোল্লা বাড়ি থেকে ভৎসর্না শুরু হলো তারপরেই। হাসমত মোল্লার ছেলে তরিকত মোল্লার স্ত্রী হুরমতি, বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে যার গলায় তেজের পরিমাণও

বাড়ছে। সকাল হতেই মৃত শ্বশুরকে অভিশাপ দিয়ে শুরু হয় তার দিন। শ্বশুরের অপরাধ চোরদের সাথে বসবাসে তাদের বাধ্য করছে। তারপর ফজর আলী এবং তার চৌদ্দগুষ্ঠিকে গালি দিয়ে গলা গরম করে। অন্তিম আঘাতটা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে আমেনার উপর। নারীরা সর্বদা নারীদের দোষই খোঁজে, হুরমতিও সব অশান্তির জন্য আমেনাকেই দোষী সাব্যস্ত করে। গ্রামেগঞ্জে প্রতিবেশী নারীদের মধ্যে কথার যুদ্ধ বেশ প্রচলিত, তা রীতিমতো মহাভারতের যুদ্ধ ছাড়িয়ে যায়। একপাশ থেকে কথার সুতীক্ষ্ণ তীর ছোড়ে তো অপর পাশ থেকে গালির ধারালো বল্লম। মাঝেমধ্যে তা চুলোচুলিতে গিয়ে শেষ হয়। তবে এই ক্ষেত্রে দৃশ্যটা ব্যতিক্রম। হুরমতি একের পর এক ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে কিন্তু আমেনার নীরব কঠিন আবরণের ঢালে তা নিমিষেই নিস্ফল হয়ে যায়। পুকুরঘাটে পানি আনতে গেলে কত কটাক্ষবাণ ধেয়ে আসে তার দিকে, সে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে কারো অনিষ্ট কামনা না করে কলসিতে পানি ভরে চলে আসে। পেছনে থেকে ভেসে আসে মুখ ভ্যাংচানো কিছু কথা, ‘চোরের বউয়ের দেমাগ দেখো না, লাজ শরম নাই, মুখ দেখায় কেমনে?

দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, সূর্যের তেজ কমে এসেছে কিন্তু হুরমতি অবিরাম বাণ ছুঁড়ে যাচ্ছে। আমেনা তার গাছের শুকনো ডাল চুরি করে রান্না করছে এই তার অভিযোগ। নিজের রান্না ঘরে ডাল ঘুটাতে ঘুটাতেই অভিশাপ দিয়ে বলল, “ও লো চুন্নি গলাত রক্ত উইঠ্যা মরবি, আমার গাছের ডাইল পুড়াইয়া যা রানছস সব যেন বিষ হইয়া যায়। বিষ খাইয়া বেবাক মর, আমার কইলজা জুড়াক।'

ফজর আলী চোখ ডলতে ডলতে বাহিরে এলো। আমেনার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুই কিছু কইতে পারস না?

আমেনা ভাতের হাড়ি উল্টিয়ে মাড় গালতে গালতে বলল, “কী কমু, এইসব আমার কপালে আছে, আল্লায় লিখ্যা দিছে। আমি চোরের মাইয়া, চোরের বউ এইসব আমারে শুনতেই হইবো।'

ফজর আলীর বুকে আমেনার এই নির্লিপ্ত ভঙ্গি শেলের মতো বিধে। মাঝেমধ্যে আমেনাকে বড়ো অকৃতজ্ঞ মনে হয় আবার কখনো কখনো নিজেকেই অপরাধী মনে হয় তার। মজিদ সকালের ঘটনার রেশ এখনো ভুলতে পারেনি। তার সামনেই তার বাবাকে

সবাই বকে গেল অথচ তার বাবা কিছু বলল না। সে পাখির পেছনে দৌড়ানো এবং গাছে ঝুলাঝুলিতে ইস্তফা দিয়ে আপন মনে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাটিতে বেত্রাঘাত করছে। সব দোষ যেন এই মাটির।

ফজর আলী ছেলেকে ভুলানোর জন্য কাছে গিয়ে বলল, কিরে টিয়া পাখির বাচ্চা ধরবি?' অন্য সময় হলে মজিদ এই প্রস্তাবে লাফিয়ে বাবার কাঁধে গিয়ে উঠতো কিন্তু এখন কেন যেন টিয়া পাখির বাচ্চাও তার মনকে আকৃষ্ট করছে না। সে বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখলো। ফজর আলী ছেলের নিরাসক্ত ভাব দেখে বলল, 'বৈকালে তোরে রতনপুরের মেলাত লইয়া যামু, মাডির ঘোড়া কিন্যা দিমু।'

রতনপুরের মেলায় যাওয়ার প্রলোভনে মজিদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, মাটির শাস্তি স্থগিত রেখে উঠান জুড়ে লাফাতে লাগলো। তারপর বাবার গলায় ঝুলে বলল, "বাজান মায় যাইবো না?

'তোর মারে জিগা।।

মজিদকে কষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে হলো না, রান্নাঘর থেকে আমেনা গম্ভীরভাবে বলল, "আমি যামু না, তোরা যা।'

ফজর সম্ভবত না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনি তালপাতার ওপাড় থেকে হুরমতির গলা ভেসে এলো, বাপ পুতে কই যায়? কার ঘরের সিঁদ কাটবো?

ফজরের আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে হলো না, উত্তর যেন হুরমতিই দিয়ে দিলো। চোরের বউদের ঘরে মুখ লুকিয়েই থাকতে হয়।

৩

মজিদ আর হাঁটতে পারছে না, বাপের কাঁধে চড়ে বসেছে চুলে মুঠো করে ধরে। মেলা থেকে আসা মানুষগুলোর দিকে হা করে তাকিয়ে দেখছে সে। তাদের কারো হাতে কাগজের ফুল, বাঁশি। কেউ অবিরত বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে সে মেলা থেকে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকটি মুখেই লাল-নীল জরি চকমক করছে। লাঠি বিস্কুট অথবা লেবেনচুশ চাবাতে চাবাতে বাচ্চারা কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরছে। রতনপুরে রায়সাহেবদের মাঠে পৌছেই মজিদের মুখের হাটার ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলো। এতো লোক সে একসাথে দেখেনি আগে, এতে কোলাহল সে শুনেনি কখনো।

বাবার হাত শক্ত করে ধরে সে হাঁটছে মেলার মধ্যে, ময়রারা বড়ো বড়ো কড়াইয়ে জিলাপী ভাজছে, একলোক চিঁট মিঠাই বানাচ্ছে তার পাশেই। হাওয়াই মিঠাই, নারকেলের সন্দেশ, বাতাসা, কদমা আরো কত কী। মজিদের লালায়ত মুখ দেখে ফজর তাকে জিলাপী আর বাতাসা কিনে দিলো চার আনা দিয়ে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি মাটির ঘোড়াও কিনে দিলো। বাতাসা চুষতে চুষতে সে বেশ জটলা দেখলো এক জায়গায়। ভেতরে কী হচ্ছে দেখার উপায় নেই। ফজর তাকে কাঁধে তুলে নিলো। মজিদ অবাক হয়ে জীবনে এই প্রথমবারের মতো বানর দেখলো। একটা লোক ডুগডুগি বাজাচ্ছে আর বানরটি হেলে দুলে নাচছে। রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে মজিদ বানর দেখতে লাগলো। আজ মজিদের বিস্মিত হওয়ার দিন, বায়োস্কোপ দেখলো, নাগর দোলায় চড়লো, সার্কাসে হাতি-ঘোড়া আর মানুষের খেলা দেখলো। মজিদের ছোট্ট বুকে এতসব অবাক করা ব্যাপার একসাথে জমা হচ্ছিল। তার মাঝেও বুকে একটা ফাকা জায়গা ছিল, সেখানে তার মায়ের জন্য আফসোস হচ্ছিল। মজিদের বেজার মুখ দেখে ফজর জিজ্ঞাসা করলো, ‘কীরে মন বেজার ক্যান, লেবেঞ্চুশ খাবি?'

মজিদ মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘মায় তো বান্দর দেখলো না।'

‘সমইস্যা নাই, তোর মায় তো তোরে দেখে। চল তোর মার লাইগা কিছু কিইন্যা লইয়া যাই।'

এবার মজিদের মুখে হাসি ফুটলো। সে বলল, ‘মার লাইগা লেবেঞ্চুশ কিন্যা লইয়া যাই।'

ফজর হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, ‘তোর মায় লেবেঞ্চুশ খায় না, নিলে তোর পেটেই যাইবো। তোর মার লাইগা শাড়ি কিনমু, পুরান শাড়ি পইরা থাকে।'

বাপ-বেটা খুশি মনে শাড়ির দোকানে গিয়ে খুব সুন্দর সবুজ একটা শাড়ি পছন্দ করলো। এক টাকা দুই আনা দামে দফারফা হলো। দাম দিতে কুর্তার পকেটে হাত দিয়ে ফজর বুঝলো, দুর্ভাগিনী আমেনার দুর্ভাগ্যমোচন হলোনা, সার্কাস দেখার ফাকে কেউ ফজরের পকেট কেটে নিয়ে গেছে।

***

নগদ অর্থ চুরি গেছে, ঘরের চাল ভাড়ারের তলায় পৌছে গেছে, অমাবস্যা আসতে আরো সপ্তাহখানিক বাকি আছে। মজিদও এখন শুধু শাক দিয়ে ভাত খেতে চায় না। তাই ফজর গিয়েছিল কলিম বেপারীর কাছে। দিনেদুপুরে ফজরকে দেখে বেশ রুষ্ট হয়েছে কলিম, চুরির মালপত্রের হিসাব দিনের আলোতে করা যায় না।

কলিম ফজরকে শাসিয়ে বলল, 'চোরের বেটা চোর তোরে না কইছি দিনের বেলা আমার কাছে আইবি না।'

ফজর মনে মনে বলল, তুমি কত সাধু, চুরীর মাল পানির দামে কিন্যা শহরে বেইচ্যা ট্যাকা কামাইছো, চোররাই তোমারে বড়োলোক বানাইছে, তুমি হইছ বড়ো চোর। মুখে বিগলিত ভাব এনে বলল, ‘বেপারী সাব গোস্যা কইরেন না, বিপদে না পড়লে এই সময় আসতাম না। কিছু টাকার দরকার আছিল।

কলিম বেপারী দ্রুত চারপাশে নজর বুলিয়ে গলা নিচু করে বলল,

‘কী আনছস?'

‘কিছু আনি নাই। আগের মালের কিছু টাকা পাইতাম, পরে দেবেন। কইছিলেন।'

কলিম বেপারী গলা খাকারী দিয়ে উঠলো, “লাথি দেয়ার আগে ভাগ। ট্যাকা চাইতে আসছে উনি, মাল লইয়া আইতে পারলে আইছ, এহন ভাগ কইলাম। শালা চোরের জাত।

***

রতনপুরের রায়সাহেব ঘোড়ার গাড়ি চলার উপযুক্ত করে বলরামপুর বাজার পর্যন্ত একটা রাস্তা বানিয়েছিলেন। সেই রাস্তার একপাশে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ফসলি জমি। সেখানে ধান, সরিষা চাষ হয়। বাতাসের দোলা খেয়ে হেলেদুলে উঠে সে ফসল। যাদের ঘামে এই ফসল হাসে তাদের বাস রাস্তার অপর পাশে। এই রাস্তা পার করে হাসিখুশি ফসলগুলো তাদের ঘরে আসে না, ফসলের ঠিকানা হয় রায়, জোয়ার্দারের গুদামে। তাদের ঘরে কদাচিৎ হাসি শোনা যায়, সেখানে ভর করে শুধু কান্না। বিভিন্ন ধরনের কান্না, ক্ষুদার কান্না, স্বামীর হাতে প্রহৃত হয়ে স্ত্রীর কান্না, স্বপ্নভঙ্গের কান্না, অসহায়ের কান্না। রায় বাবুর ঘোড়ার গাড়ির ধুলায় সে কান্না হারিয়ে যেতো, এখনো যায়। ফজর আলীর কানেও কান্না এলো। সে সাধারণত কান্না এড়িয়ে যায়, কিন্তু আজ এড়িয়ে যেতে পারলো না। মাস্টার বাড়ি থেকে যে কান্না ভেসে আসছে তা তার অতি পরিচিত। মজিদ কাঁদছে, বুকটা ধক করে উঠলো। দৌড়ে মাস্টার বাড়ি ঢুকে দেখলো, উঠানের নারকেল গাছের সাথে মজিদকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাস্টার মশাইয়ের বেত দিয়ে তার চৌদ্দ বছরের কিশোর ছেলে সপাং সপাং করে মজিদের গায়ে আঘাত করছে। মজিদের কোমল চামড়ায় প্রতিটি আঘাত দাগ ফেলে গেছে। মজিদ চিৎকার করে তার মাকে ডাকছে। মজিদ তার বাজানকে দেখে চিৎকার থামিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। ফজর আলী তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে বাঁধন মুক্ত করলো। মজিদ তার বাবার বুকে সিটিয়ে গেল। শ্বাস টেনে টেনে এখনো কেঁপে উঠছে। মাস্টার মশাইয়ের ছেলে নিতাই মাটির দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে অভিযোগ করলো, আমার ঘোড়া চুরি করছে।

ফজর দেখলো গতকাল মেলা থেকে কিনে দেয়া ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে আছে, পার্থক্য শুধু ঘোড়াটির মাথাটি অনুপস্থিত। মাথাটি দূরে অবহেলায় নিঃসঙ্গভাবে পড়ে আছে। ফজর আলী মাটি থেকে ধড়হীন ঘোড়াটি তুলে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি মেলা থিক্যা কাইল কিন্যা দিছি, আমার পোলায় চুরি করে নাই।'

মাস্টারের গিন্নী এবার এগিয়ে এলো, মুখ ভ্যাঙচিয়ে বলল, “উঃ চোরের পোলায় সাধু, এই পোলারে যেন আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় না দেখি। আবার দেখলে বাপ-পোলা

দুইজনরে বাইন্ধা পিটামু।'

ফজর আলী আর অযথা বাক্যব্যয় করলো না। মুণ্ডুবিহীন ঘোড়াটি মজিদের হাতে তুলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলো। মজিদ তার বাজানের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, তার বাজানের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

আমেনা ফজরের সাথে একটা কথাও বলেনি। মজিদ কেঁদে কেঁদে সব বলল তার মায়ের কাছে। আমেনার মুখটা যেন আরো কঠিন হয়ে গেল। দাওয়ার নিচে দাঁড় করিয়ে কাঠের চামচ যেটাকে তারা ডেউয়া' বলে তার উল্টো পিঠে এক চিমটি লবণ রেখে মজিদকে খাওয়ালো তার ভয় তাড়ানোর জন্য। মজিদের ভয় তার মাকে দেখেই পালিয়েছে। তবুও আমেনা মজিদের বুকে ছিটিয়ে দিলো একদলা থুতু। থুতুগুলো যেন ফজরের মুখে গিয়ে পড়ল। নিজেকে অপরাধী ভাবতে লাগলো ফজর। আমেনার মনেও দাগ পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো মজিদের গায়ে পড়া দাগের চেয়েও গাঢ়।

রাতে শুয়ে ফজরের চোখে ঘুম আসছিল না। মজিদ, আমেনা আর ফজরের মাঝখানে দেয়ালের মতো শুয়ে ছিল। একমাত্র দেয়ালটা ঘুমিয়ে ছিল দুইপাশের মানুষগুলোর চোখে ঘুম নেই। ফজর দেয়াল ডিঙ্গিয়ে আমেনাকে ডাকলো, 'বউ!'

আমেনা জেগে ছিল কিন্তু চোখ মেলল না, ঘুমের ভান ধরে পরে রইলো। ফজর আলী ঘুমন্ত বউকেই উদ্দেশ্য করে বলল, "মজিদের কসম, আমি আর চুরি করমু না বউ।'

সাথে সাথে আমেনার চোখ খুলে গেল, কিন্তু মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। তাকে দেখে বুঝা গেল না, সে ফজরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছে কি না।

রাতের আঁধারে স্ত্রী-পুত্রের সাথে শুয়ে করা প্রতিজ্ঞা দিনের আলোতে চালের ভাঁড়ার দেখে টলমল করে উঠলো ফজরের। কিন্তু হাত বাঁধা, মজিদের চেহারা আর আমেনার সেই নির্লিপ্ত চোখ মনে করে নিজেকে নিবৃত্ত করলো।

কাজের খোঁজে ফজর কতজনের কাছে গেল। কাজীসাহেব দাঁত খিচালেন, খাঁসাহেব মুখ ভ্যাঙচালেন, মির্জাসাহেব চোখ রাঙালেন, সরকারসাহেব লাঠি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ক্লান্তি আর হতাশামাখা মুখ নিয়ে ফজর অবশেষে গেল জোয়ার্দারসাহেবের বাড়ি। জোয়ার্দারসাহেব এই বলরামপুরের রায়সাহেব। সম্পত্তির হিসাবে খাঁমির্জারা তার কাছে

চুনোপুটি। এই অঞ্চলের অর্ধেক পুরুষ তার জমিতে কামলা খাটে। জোয়ার্দারসাহেবের সাথে সরাসরি দেখা করার উপায় নেই, তার নায়েব সব দেখাশুনা করে। ফজর নায়েবের কাছে গিয়ে নিজের আর্জি পেশ করলো। নায়েব ফজর আলীকে চিনত, চিনত বলেই বিপত্তি। নায়েব মশায় চোখ কুঁচকে বলল, তোমারে কাম দিয়া কি বিপদে পড়বো নাকি?

ফজর আলী হাতজোড় করে বলল, আমি চুরি ছাইড়া দিছি, এই লাইগ্যাই তো কাম চাইতে আইছি।

নায়েব মশাই ঠোঁট গোল করে পানের পিক ফেললেন, তারপর বললেন, ‘হেঃ কথায় আছে, কইলা ধুইলে মইলা যায় না। না বাপু অন্য কোথাও দেখো, এইখানে হইবে না।'

কিন্তু ভাগ্যদেবীর বোধহয় অন্য ইচ্ছা ছিল, জোয়ার্দারসাহেব সে সময় আহার শেষে হাঁটতে বের হয়েছেন। ফজরের আহাজারী তার কানে গেল। আজ জোয়ার্দারসাহেবের মন ভালো, তার ছোটো গিন্নী অভিমান ভেঙ্গে হাসিমুখে তার মুখে পান ঠেলে দিয়েছে। অভিমান ভাঙার পেছনে তার হাতের নতুন সোনার বালা জোড়ার বেশ ভূমিকা আছে। জোয়ার্দারসাহেব, এগিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার নায়েব, কী সমস্যা?

নায়েব উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে বলল, “কিছু না, এই ব্যাটা চোর আইছে কাম চাইতে। মানা করলাম, তাও যায় না।'

জোয়ার্দারসাহেব খুব বিষয়ী এবং বুদ্ধিমান লোক। অর্থসম্পত্তি তার যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার ক্ষমতাও চাই। সামনের ইলেকশনে মুসলিম লীগের নমিনেশন চাইবেন। তার কাছে এখন সবাই ভোটার, সে চোরই হোক আর ডাকাতই হোক। তিনি এখন দয়া দেখানোর সুযোগ পেলে সহজে হাতছাড়া করেন না। হাতজোড় করা ফজর আলীর দিকে একদফা তাকিয়ে নায়েবকে বললেন, ‘রাইখা দেও।'

“কিন্তু হুজুর?'

‘যা বলছি তা করো।' বলেই জোয়ার্দারসাহেব ছোটো বিবির দেয়া পান জাবর কাটতে কাটতে হাঁটতে লাগলেন। একটা ভোট বৃদ্ধিতে তার মন আরো ভালো হয়ে গেল।

***

গোড়ালি কাদা পানিতে ডুবিয়ে লাইন ধরে ধানের চারাগুলো ছপ ছপ করে পুঁতে দিচ্ছিল কামলারা। তাদের লাইনে তেইল্যা চোরাকে দেখে সবাই অবাক এবং ক্ষুব্ধ হলো। কেউ কেউ নায়েব মশাইয়ের কাছে অভিযোগও এলো নিয়ে। কামলাদের মধ্যে কদম হোসেন সবচেয়ে বেশি রুষ্ট হলো। কিন্তু নায়েব মশাই বলে দিলেন, জোয়ার্দারসাহেবের হুকুম। সবাই কাজে ফিরে গেল কিন্তু মনে জ্বালাটা রয়ে গেল। কদম হোসেন গোড়ালি পানিতে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাইজানেরা হগলের জিনিসপাতি সামলাইয়া রাইখো। এইখানে সবাই বালা মানুষ না।'

ফজর আলী কিছু বলল না, নীরবে ধানের চারা পুঁতে গেল। যোহরের আজানের সাথে সাথে কামলারা কাজ বন্ধ করে দিলো। একদল চলে গেল নামাজ পড়তে, আরেকদল গিয়ে উঠানের এক কোণে জটলা পাকিয়ে বসলো মধ্যাহ্ন ভোজনের অপেক্ষায়। ফজর আলী চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। দিনেরবেলা তাকে কখনো এত কাজ করতে হয়নি। মাটির সানকিতে মোটা চালের ভাত দেয়া হলো। নিমিষেই সানকি ছেচে সব ভাত খেয়ে ফেলল ফজর। ভাত শেষ করার পরই তার মজিদের কথা মনে হলো। তার অপুষ্ট, ক্লীষ্ট মুখখানা কল্পনা করতেই নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার। বাড়ির পাশেই কৃষ্ণচূড়াগাছ ডালাপালা মেলে আছে, তার ছায়ায় বসতেই ফজরের ঝিমুনি চলে আসলো। ঝিমুনিতেই একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল সম্ভবত, সুখের কোনো স্বপ্ন।

হঠাৎ ভেতর বাড়ি থেকে গোলমালের শব্দ পাওয়া গেল। ভেতর বাড়ি থেকে সেটা বাড়ির উঠান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। ফজর উঠানে আসলো ব্যাপারটা বুঝার জন্য। ভেতর থেকে জোয়ার্দারসাহেবের ছোটো গিন্নীর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তার অভিমানার্জিত হাতের বালাজোড়া পাচ্ছেন না।

উঠানের ভিড় থেকে হঠাৎ কদম হোসেন বলে উঠলো, ‘খাল কাইট্টা কুসুর আনছে জোয়ার্দার সাবে। এহন টের পাইলো তো।

কদমের কথায় সবার যেন সম্বিত ফিরলো, অনেকগুলো সন্দেহের চোখ ফজরের দিকে ঘুরে গেল। আরেকজন বলে উঠলো, এতক্ষণ তো দেখি নাই আমাগো লগে।'

সাথেই সাথেই আরেকজন বিজ্ঞ উত্তর দিলো, চুরির মাল হাপিস করতে গেছিল।'

এভাবে নিজেদের প্রশ্ন উত্তরে তারা ফজরকে চোর সাব্যস্ত করলো। অবশ্য তার পূর্ব পরিচয় জানার পর সাব্যস্ত করার কিছু প্রয়োজন ছিল না। বালাজোড়া যে ফজরই নিয়েছে সে ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহই রইলো না। দোষী সনাক্ত হওয়ার পর চোরের পিঠের উপর জনগনের একটা অধিকার জন্মায়। কেউ নিজেদেরকে অধিকার বঞ্চিত করলো না। প্রথমেই ফজরকে পেছন দিক থেকে বেঁধে দিলো। তারপর বৃষ্টির মতো কিল ঘুষি তার সারা শরীরে বর্ষিত হতে লাগলো। ঘামে ভেজা কুর্তাটা ছিড়ে গেছে অনেক আগেই। লুঙ্গিটা কোনো রকমে কোমরে জড়িয়ে আছে। ঠোট কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, পিঠের দিকেও চামড়া কেটে গেছে, হাতের কয়েকটা আঙুল বুঝি ভেঙ্গেই গেছে। বাঙালি পুরুষ যখন বউ আর চোরকে শায়েস্তা করে তখন তার মনে কোনো মায়া থাকে না। ফজরের ভাগ্য খারাপ; জীবনে নানা দিকে পরাজিত বাঙালি পুরুষে ভরা ছিল সেই উঠান। তারা সুযোগ পেয়েছে, আজ তারা জিততে চায়, বীরপুরুষ হতে চায়, পরাজয়ের সব গ্লানি আজ মুছে ফেলতে চায়। ফজর একটু কথা বলার সুযোগ পেলেই বলে উঠছে, আমি কিছু করি নাই। আমার পোলার কসম, আমি চুরি করি নাই।'

উঠানের মাঝখানে ফজর অর্ধচেতন হয়ে পড়ে আছে। বীরপুরুষেরা নায়েব মশাইয়ের বাধায় নিজেদের কাজ স্থগিত রেখেছে। নায়েব মশাই সবাইকে বললেন, কেউ কিছু করবা না, জোয়ার্দার সাব গঞ্জে গেছে। তিনি ফিরা আসলে বিচার হবে। এহন সবাই কামে যাও।

এমন বিনোদনের হঠাৎ সমাপ্তি তার উপর তপ্ত রোদে মাঠে ঘাড় নুইয়ে কাজ করার ফরমান, উজ্জ্বল চোখমুখগুলোতে আঁধার নেমে এলো। কিন্তু উপায় নেই, মনে অতৃপ্তি নিয়ে সবাই মাঠে কাজ করতে গেল আর মনে মনে জোয়ার্দারসাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কাঁঠালগাছের সাথে বাঁধা হয়েছে ফজরকে। এতক্ষণ মার খেয়েছে কিন্তু ব্যথা পায়নি, এখন ধীরেধীরে ব্যথাটা টের পাচ্ছে, সমস্ত শরীর জুড়ে ভেঁতা একটা ব্যথা। ফজর আলী ব্যথা থেকে মনোযোগ সরিয়ে মজিদ আর আমেনার কথা চিন্তা করতে লাগলো। আমেনা হয়তো ভাববে সে সত্যই আবার চুরি করেছে, নিজের ছেলের গায়ে হাত দিয়ে কসম কাটার

পরেও চুরি করেছে। আমেনার কঠিন মুখটি চিন্তা করে ফজরের মনেও ব্যথা হতে লাগলো। সে ব্যথা শরীরের ব্যথার চেয়েও বহুগুণ বেশি।

বৈঠক ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসে আছেন জোয়ার্দারসাহেব। পানের রসের কারণে কথা বলতে পারছেন না। চিলুমচি ধরে রেখেছে এক চাকর পানের পিকের আশায়। উঠানে ফজরকে মাটিতে বসানো হয়েছে, সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির মহিলারা চোর দেখার জন্য বৈঠক ঘরের জানালা ফাক করে উঁকিঝুকি করছে। একটা মানুষের ভাগ্য তার হাতে, নিজের ক্ষমতা চিন্তা করেই জোয়ার্দারসাহেবের মুখে প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ল। আজকের দিনটা বড়ো ভালো গেল। পানের পিক চিলুমচিতে ফেললেন, চাকরের অপেক্ষা শেষ হলো, সাথে কামলাদেরও। জোয়ার্দারসাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "আমি দয়ালু মানুষ। দয়া কইরা কাম দিছি। আমার ঘরেই কিনা এই কাম করলো, এই বেইমানরে কি করতাম?'

ভিড় থেকে কদম হোসেন এগিয়ে এসে বলল, "ক্ষমা দেবেন জোয়ার্দার সাব, এই তেইল্যা চোরায় আমার ঘরেও চুরি কইরা আমার সর্বনাশ করছে। আমি কইকি খেজুরের কাঁটা দিয়া তার চোখ গাইল্ল্যা দেই।'

কদম আগেই দুটি খেজুরের কাটা জোগাড় করে রেখেছে, চোখ গালার এমন সুযোগ সে আর কাউকে দিতে চায় না। এই প্রস্তাব বিপুল জনসমর্থন পেলো। জোয়ার্দারসাহেব মনে মনে ক্ষুন্ন হলেন, এই ফকিন্নীর বাচ্চা নিজের ঘরের চুরির কথা বলে নিজেকে জোয়ার্দারের সাথে মিলাতে চাইছে, আবার বিচারের রায়ও দেয়। ধমকে বলে উঠলেন, এই গাধাটারে কামে রাখছে কে? আইছে চোখ গালতে। চাবকাইয়া চামড়া তুইল্যা ফেলমু শালা ফকিন্নীর বাচ্চা।

কদম হোসেন ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। তার রায়ে সমর্থনকারীরাও জোয়ার্দারসাহেবের সমর্থনে কদমকে চোখ রাঙ্গিয়ে দিলো। জোয়ার্দারসাহেব নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'চোখ গাললে তো তোমার ঘরেই আসবো ভিক্ষা চাইতে। আমি থানার বড়ো দারোগারে খবর দিছি, আইয়ুবসাহেবের আইনের দেশ, বিচারও হইবো আইন মতো।'

কামলাদের সমাবেশে গুঞ্জন উঠলো, "ঠিক ঠিক।

বাঙালি কিছু পারুক আর না পারুক চাটুকারিতা ঠিক পারে। এই 'ঠিক ঠিক' গুঞ্জনেও সেই চাটুকারিতা ঝরে পড়ছিল, যদিও সবার হাত নিশপিশ করছিল, চোখ গালার দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হলো।

দারোগাসাহেব চোর ধরতে এসেছেন নাকি ভুড়িভোজ করতে এসেছে বুঝা যাচ্ছে না। জোয়ার্দারসাহেবের পাশে বসে তিনি একের পর এক আম কনুই ভিজিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন। সাথে আসা দুইজন সিপাইয়ের অবস্থাও তদরূপ। তাদের দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন কিছু খায়নি। আমের বাটিটি আম শূন্য হলে জোয়ার্দারসাহেব চোরের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'দেখেন কী করা যায়।

কিন্তু দারোগা সে আলাপের চৌকাঠ মাড়ালো না, হাতে লেগে থাকা রস চাটতে চাটতে বলল, 'কতদিন বড়ো রুইয়ের মাথা খাই না, আপনার পুকুরে রুই আছে না?

পুকুর থেকে রুই উঠলো, খাসি জবাই হলো। বেশ কিছু ফলফলাদি এবং সন্দেশ মিষ্টি খাওয়ার পর দারোগাসাহেবের চোরের কথা মনে হলো। জোয়ার্দারসাহেব মনে মনে ভাবলেন, ভাগ্যিস গোয়াল ঘরের দিকে নজর পড়েনি খাদকের। দারোগাসাহেব বললেন, 'চোর আমি নিয়ে যাবো কিন্তু চুরি করেছে কী?

'আমার গিন্নীর হাতের বালা।

'গিন্নীর বালা চোরের হাতে, সর্বনাশ। চোর কি স্বীকার করেছে? বালা ফেরত দিয়েছে?

'স্বীকার করেছে কিনা জানি না, আমি তো জিজ্ঞাসাই করলাম না। আপনার জন্যই অপেক্ষা।

'জিজ্ঞাসা করে অবশ্য লাভও নেই, কথায় কাজ হবে না, লাঠির গুতা খেলে সব ফরফর করে বলে দেবে। বালাও বের হবে হারও বের হবে, চুরি করার স্বাদও মিটে যাবে।'

'কিন্তু হার তো চুরি করে নাই!

না করলেও বাহির করে দেবে। আমার সিপাই এমন প্যাদানি দেবে সব বের করে দেবে।

এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে ছোটো গিন্নী ডাকলো জোয়ার্দারসাহেবকে। দারোগা মুখ ঘুরিয়ে সে ডাকের উৎস খুঁজতে লাগলেন, না পেয়ে হতাশ হলেন। জোয়ার্দারসাহেব ভেতরে চলে গেলেন। গিন্নী কি আবার অভিমান করেছে নাকি? গিন্নীকে দেখে তা মনে

হলো না। জোয়ার্দারসাহেব কাছে যেতেই ঠোট উল্টিয়ে ফোঁপানো শুরু করলো। কাঁদার চেষ্টা করছে বোধহয়।

জোয়ার্দারসাহেব বললেন, 'ভনিতা বাদ দিয়ে বলো কী হয়েছে?

গিন্নী কণ্ঠে এক লিটার মধু ঢেলে বলল, "আপনে এত সখ কইরা বালাগুলান আমারে দিছেন, আমি গোসলের সময় যত্ন কইরা খুইলা পালঙ্গের উপর রাখছিলাম, আপনের ছোটো পোলায় সেই বালা খেলতে খেলতে পালঙ্গের নিচে নিয়ে ফালাইছে। আমি আইসা দেখি বালা নাই, এত সখ কইরা দিলেন, না দেইখা মাথা গরম হইছিল। এহন ঝাড়ু দিতে গিয়ে বালাগুলান খাটের নিচ থেকা পাইছি।'

জোয়ার্দারসাহেব দাঁতমুখ খিচে আছেন। মাঝেমধ্যেই নিজেকেই দুষেন তিনি। কোন কুলক্ষণে কম বয়সি মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। জোয়ার্দারসাহেবের মুখভঙ্গি দেখে ছোটো গিন্নী আবার কাদার চেষ্টা করলো। এবারের চেষ্টা সফল হয়েছে। জোয়ার্দার মাথা চুলকে গলা নামিয়ে বললেন, 'হইছে আর টঙ করন লাগবো না। বালাগুলান মাইকশে তালা দিয়া রাখো। কাউরে কিছু কওনের দরকার নাই।'

'কিন্তু তেইল্যা চোরার কী হইবো?"

'সেইডা আমি দেখতাছি।'

জোয়ার্দারসাহেব বাহিরে এসে দেখলেন, সিপাহী দুটি লাঠি হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। জোয়ার্দারসাহেবের অপেক্ষায় ছিল তারা। পুলিশের ভাষায় 'গুতা' বলতে যা বোঝায় তাই শুরু করবে। জোয়ার্দারসাহেব দারোগাকে বললেন, 'আল্লায় দিলে আমার সহায় সম্পত্তি কম না, এক জোড়া বালা গেছে, যাক। আপনে এখন এরে নিয়ে যান। পরে কী করা লাগে আমি দেখুম। দারোগাসাহেব দ্বিরুক্তি করতে গেলেন, কিন্তু প্রবল বেগে একটি ঢেকুর আসলো, ঢেকুর তুলে মেনে নিলেন। জোয়ার্দারসাহেব মনে মনে ভালো ফন্দি আঁটলেন, এখন যদি জানাজানি হয় ফজর চুরি করেনি তবে দারোগা কিছু বলবে না কিন্তু মনে মনে ক্ষেপবে আর মানুষজন তাকেই 'পাষাণ' বলবে। পুলিশ ধরে নিয়ে যাক, তিনি গিয়ে মামলা উঠিয়ে ফজরকে ক্ষমা করে দেবেন। মুখে মুখে লোকজন বলবে "আহা জোয়ার্দারসাহেবের

শরীরে খালি দয়া আর মায়া, এমন ভালা মানুষ আর দেখা যায় না" আরেক খিলি পান মুখে দিয়ে জোয়ার্দারসাহেব আরামে চাবাতে লাগলেন।'

পল্লীগ্রামে সন্ধ্যা বলতে কিছু নেই, সূর্য ডুবলেই সেখানে রাত। ঝিঝিপোকাগুলো অবিরাম ডেকে ডেকে রাতকে গভীর করে তুলে। ঝিঝি পোকাদের ডাকাডাকির মধ্যেই নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে কোমড়ে দড়ি বেঁধে তেইল্যা চোরাকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। দিনেরবেলা হলে বাচ্চাদের মিছিল থাকতো পেছনে, মহিলারা ঘর থেকে উঁকি দিয়ে দেখতো। পুরুষেরা দুই দণ্ড কোমর সোজা করে তাকিয়ে থাকতো। এখন তেমন কিছুই নেই। পথটা মোল্লা বাড়ির সামনে এসে বেঁকে গেছে। ফজরের বুকটা হু হু করে উঠলো, একবারও কি দেখবে না তার মজিদকে, আমেনা কি অভিমান করে আছে তার উপর। অভিমান নয়, বোধহয় ঘৃণাই করছে, নয়তো সারাদিনে কি সে খবর পায়নি? একবারও তো আসেনি দেখতে। মোল্লাবাড়ি পার হয়ে চলে যাচ্ছে তারা। ফজর বারবার পেছন ফিরে দেখছে। সেখানে তার মজিদ আছে, আমেনা আছে আর আছে দুটি বিষন্ন কদম গাছ।

৪

হাজতে গিয়ে ফজরের মনে হলো, কদম যদি তার চোখ গেলে দিতো, সবাই মেরে যদি তার হাত পা ভেঙ্গে দিতো, তার মাথা ফাটিয়ে দিতো তবুও তা এই হাজতে রাত কাটানোর চেয়ে ভালো হতো। লোহার গারদে আটকানো ছোটো একটি জায়গা। চারজন যে ঘরে থাকলে পায়ের সাথে পা ঠেকবে সেখানে এই ঘরে প্রায় বিশজন মানুষ আছে। তাদের সবার নিঃশ্বাসে ঘরের বাতাস আদ্র এবং ভারী হয়ে আছে। ঘরের এককোণা সবাই প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য ব্যবহার করছে, সেখান থেকে উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে, নিঃশ্বাস নেয়া দায়। কেউ কেউ সেই গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বমি করে দিয়েছে এবং উৎকট গন্ধটা তাতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। তার উপর দুই একজন নির্বিঘ্নে বিড়ি টেনে হাজতটাকে নিঃশ্বাস নেয়ার অনুপযোগী করে তুলেছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মৃদু আলোর সেই স্থানকে পৃথিবীর নরক বলা যায়। ফজর তার আশেপাশের নরকবাসীদের দিকে চোখ বুলালো। অধিকাংশই পুলিশের আতিথেয়তায় অথবা বিড়ি গাজার নেশায় অর্ধমৃত। তাদের মধ্যে একজন মোটা চশমা পরা ভদ্রগোছের ছেলেকেও দেখা গেল। সে বমি করেছে, তাই একজন হাবিলদার তাকে লাঠি দিয়ে পেটে খোচা দিয়ে গেছে। খোচা শব্দটা ব্যবহার করলে সেই আঘাতের প্রচণ্ডতা বুঝা যায় না। পুলিশ বলে 'গুতা'। গুতা খেয়ে ছেলেটা বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল কিছুক্ষণ। ফজর ভাবতে লাগলো, এমন ভদ্র ছেলে কী এমন করলো যে তাকে এই নরকে আসতে হলো। ফজর ভাবলো ছেলেটাকে একটু শুশ্রুষা করবে কিন্তু সে নিজেই নড়তে পারছে না। মায়া দেখানোর জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে অনুপযোগী স্থান এটা।

পা দুটো ছড়িয়ে একটু শোয়ার চেষ্টা করলো ফজর। পা সোজা করতে গিয়েই পা ঠেকলো একজনের বুকে। সেই লোকটি উঠে বসলো, চেহারাটা দেখলেই ভয় ধরে যায়। লোকটির চেহারা খারাপ নয় কিন্তু কোনো কারণে যে ভয়াল একটা ব্যাপার তার চেহারায় আছে তা বোঝা যায় না। লোকটি সিগারেট টানছিল, ফজরের দিকে তাকিয়ে তুই করে সম্বোধন করে বলল, "কী করছস?"

‘মাপ করে দেন ভাই, আমি আপনেরে দেখি নাই, পা বেদনা করতাছিল, একটু ছড়াইয়া দিতে চাইছিলাম।'

‘এইটা তোর শ্বশুরবাড়ি পাইছোছ? পা চ্যাগাইয়া আরাম করবি। শ্বশুরবাড়ি যাইবি পরশু, তখন আরাম করিছ। আমি জিগাইলাম, কী কইরা আইছস? রেইপ কেইস?

‘আমি কিছু করি নাই।

লোকটা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর বলল, “তাইলে তোর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া নিশ্চিত। আমি তিনডা খুন করছি, ঢাকায় যেই কোনো চিপায় গিয়াও আমার নাম কইলে চিনবো, নাদির গুন্ডা। এদিকের পুলিশ আমারে চিনে না, এই জন্যই ভিতরে বইসা আছি, একটু পরেই আমি গারদের ঐ পাশে থাকমু। এইখানে যারা কিছু করে না, তারাই ফাইসা যায়।'

একটু থেমে তারপর আবার বলল, “দেইখা তো মনে হয় টাকাপইসাও নাই, বাড়িতে জমিজমা আছে?

‘ভিটাবাড়ি আছে।'

‘তুই শেষ। কী কাম করছ?

ফজর মাথা নোয়ালো, কিন্তু কিছু বলল না। নাদির গুন্ডা আবারো হো হো করে হেসে উঠলো। এই লোকটা হাসতে পারে, মন খুলে হাসে। তারপর বলল, তোর নজর দেইখাই বুঝছি, তোর মতো ভ্যান্দা তো ডাকাতি করতে পারবি না, সিঁদ কাইটা চুরি করস?'

ফজর মাথাটা নুইয়েই রাখলো। ভদ্র মানুষের ভিড়ে নিজের পরিচয় নিয়ে কখনো লজ্জিত হয়নি সে, অথচ চোরডাকাত খুনিদের মাঝে বসে সে নিজের পরিচয়ের জন্য লজ্জা পাচ্ছে। কারণ যেদিন রাতে সে মজিদের গায়ে হাত দিয়ে কসম কেটেছে, সেদিন থেকে সে নিজেকে আর চোর মনে করে না। নাদির গুন্ডা চুপ থাকতে দেখে ফজরকে জিজ্ঞাসা করলো, “বাইত কে কে আছে?

‘বউ আর পোলা আছে।'

নাদির গুন্ডা হিংস্র মানুষ কিন্তু শুধু তার শত্রুদের জন্য। আপনজনদের জন্য তার ভালোবাসা অপরিসীম। কিন্তু সমস্যা হলো তার আপনজন বলতে কেউ নেই, পরিবার

নেই তার। মা-বাবার নাম পর্যন্ত মনে নেই তার। বিয়ে করতে চেয়েছিল একবার কিন্তু পাত্রী শেষ মুহূর্তে পালিয়ে যায়। তারপর আর বিয়ে শাদির পথ মাড়ায়নি সে। কিন্তু কারো পরিবারের কথা শুনলেই মন নরম হয়ে যায় তার। নাদির গুন্ডা সিগারেটের একটা প্যাকেট ফজরের দিকে ছুড়ে মারলো। ফজর প্যাকেট হাতে নিয়ে বলল, “আমি তো তামুক বিড়ি খাই না।'

নাদির শুয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, ‘তোরে খাওয়ার লাইগা দেই নাই। কাইলকা তোরে জেলহাজতে পাঠাইবো। ঐখানে কামে লাগবো। লুঙ্গির কেঁচায় লুকাইয়া রাখিস। অহন ঠ্যাং সরা, আমি গেলে ঠ্যাং ছড়াইয়া ঘুমাইস।

ফজর ভেবে পেলো না, এই লোকটা কীভাবে যাওয়ার কথা বলে, তেমন কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। আর সিগারেটের প্যাকেটই বা কী কাজে লাগবে?

একটু পরে তালা খুলে একজন হাবিলদার বলল, ‘নাদির কে? আসেন।

নাদির বের হওয়ার সময় ফজরের দিকে একটা মুচকি হাসি দিয়ে চলে গেল। লোকটাকে প্রথম যেমন হিংস্র দেখাচ্ছিলো এখন তেমন লাগছে না।

রাত গভীর হওয়ার আগেই অনেক নরকবাসী মুক্তি পেলো। ডাকাত-খুনি সব চলে গেল, পড়ে রইলো নিরীহ ফজর আলী, চশমা পরা ছেলেটি আর গাজার নেশায় অচেতন কিছু মানুষ। চশমা পরা ছেলেটির জ্ঞান ফিরেছে, সে চোখমুখ শক্ত করে এক কোণায় বসে আছে। ফজর তার কাছে গিয়ে বলল, “এখন কেমন লাগছে?

ছেলেটি খুব বিরক্তি নিয়ে তাকালো কিন্তু কিছু বলল না, তার চশমার ডান দিকের কাঁচটি হাবিলদারের রুলারের আঘাতে ফেঁটে গিয়েছে। ফজর আলী একটু বিব্রত হলো কিন্তু হাল ছাড়লো না, পকেট থেকে সিগারেট বের করে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বিড়ি খাইবেন?

ছেলেটির কপালে বেশ কয়েকটি ভাঁজ পড়ল, বিরক্তির মাত্রা বুঝলো যেন। ফজর আলী আরো কিছু বলার আগেই, একটা লোক এলো গারদের সামনে। লোকটা পুলিশ নয়, মধ্যবয়স্ক একজন লোক। গায়ের পোশাকে বেশ সম্ভ্রান্ত মনে হয়। লোকটিকে দেখেই ছেলেটি ধড়ফড় করে উঠলো। সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, চাচা আমারে বের করেন,

দোহাই চাচা এইখানে থাকলে বাঁচবো না চাচা। আপনি যা বলবেন আমি মাথা পাইতা নিবো।'

লোকটি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "শুয়োরের বাচ্চা, শরম করে না আবার আমারে চাচা ডাকতে। তুই লজিং মাস্টার হইয়া কোন সাহসে আমার মাইয়ারে লইয়া ভাগছস? আমার মাইয়াডার বয়স কম, বুঝে না, তুই হারামজাদা কোন সাহসে গেছস? তোরে আমি জেলের ভাত খাওয়ামু কুত্তার বাচ্চা।'

লোকটি চলে গেল, ছেলেটি হাত পা এলিয়ে বসে পড়ল, তার সব আশার সলিল সমাধি ঘটলো। সে ফজরের হাতের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে দিলো, কিন্তু ধরানোর জন্য কোনো আগুন পেলো না। সিগারেটটি ঠোট থেকে ছুড়ে ফেলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো।

ফজর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ছাদের দেয়ালে পলেস্তারা ঝুলে আছে, যেকোনো সময় পড়বে। ছেলেটি এখনো কাঁদছে, মেয়েটির জন্য নিশ্চয়ই কাঁদছে না। জেলে হাজতে নিজের চিন্তা ছাড়া অন্য কারো চিন্তা মাথায় আসে না। কিন্তু ফজরের আমেনা আর মজিদের কথা মনে হলো। কী করছে তারা? মজিদ কি তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে না বাজানের কথা? আমেনা কি বলবে ছেলেকে? ঘরে চাল ছিল না, তারা কি খেয়েছে, কী খাবে? অজান্তেই ফজরের চোখ বেয়ে জল নেমে এলো। এই হাজতের নরক পুস্পতুল্য, আসল নরক তো তার বুকে।

দারোগাসাহেব খুবই কৃতজ্ঞ মানুষ, জোয়ার্দারসাহেবকে রুই মাছের মাথা আর খাসির গোশতের প্রতিদান ঠিকই দিলো। ফজরের নামে স্বদ্যোগে কল্পিত চার-পাচটা মামলা তৈরি করে ফেলল। দারোগার খাতায় ফজরের পদোন্নতি হলো, চোর থেকে ডাকাত হলো।

জোয়ার্দারসাহেব ভুলোমনা মানুষ। ছোটো গিন্নীর আহ্লাদে তার থানায় গিয়ে মামলা তুলে ফেলার কথা ভুলেই গেলেন। আয়েশে পান চাবাতে চাবাতে গিন্নীকে বললেন, তোমার পানে এত মধু কেন? সব ভুইলা যাই, কী জানি একটা কাম আছিল মনে পড়ছে না।'

গিন্নী হেসে বলল, 'মনে না পড়লে, জরুলী কিছু না। আরেক খিলি পান দেই?

আদালতেও একটা হাজত আছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ছোটো। যারা বানিয়েছে তারা হয়তো ধারণা করেনি প্রতিদিন এত অতিথির আনাগোনা হবে। যথারীতি গাজা-বিড়ির গন্ধে নিঃশ্বাস নেয়া দায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। একজনের ঘামে আরেকজনের শরীর লেপ্টে যাচ্ছে। ফজর নাকটা উঁচিয়ে কোনোরকমে শ্বাস নিচ্ছিলো। কথাবার্তা, চিৎকার চেঁচামেচি, কান্না আর্তনাদের মাঝেও ফজর নিজের নামটা শুনতে পেলো। ফজর আলী, বাপকা নাম কসর আলী, ইধার আও। তোমহারা নম্বর আয়া হয়।

আদালতের মধ্যেও কোলাহলটা কম ছিল না। একজন ছোটোখাটো মানুষ একটা বড়োসড় চেয়ারে বসে আছেন, তার পেছনে একজন পেয়াদা, উপরে একটা ছবি। ছবির লোকটি আইয়ুব নয়তো ইয়াহিয়া হবে। ফজরের কাছে আইয়ুব, ইয়াহিয়া একই বস্তু। তাদের কাউকেই সে চিনে না। তারাও ফজর আলীদের চিনে না। ফজর আলী দাড়িয়ে সবার মুখ দেখছিল, কালো আলখেল্লা পরা লোকগুলো বেশি চেঁচামেচি করে। কে কী বলল কিছুই বুঝলো না ফজর। চেয়ারে বসা ছোটোখাটো লোকটি কি কিছু বুঝছে? তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না, যদি কিছু না বলবে তো ডেকে আনলো কেন? ফজর আলী ভিড়ের মধ্যে আমেনা আর মজিদকে খুঁজতে লাগলো। ঘোমটা পরা কোনো মহিলা দেখলেই তার বুকটা ধক করে উঠে, বাচ্চাদের কান্না শুনলে শুধু মনে হয় মজিদ কাঁদছে। চোখগুলো ক্লান্ত হয়ে গেল, মানুষগুলো মুখস্ত হয়ে গেল কিন্তু মজিদ আর আমেনাকে খুঁজে পেল না।

অনেকক্ষণ পরে চেয়ারে বসা লোকটি বিড়বিড় করে কী যেন বলল, যা বোঝার সাধ্য ফজরের নেই। দুইজন পুলিশ এসে ফজরকে নামিয়ে নিয়ে গেল। ফজর কিছু বুঝতে না পেরে একজনকে বলল, "কী কইছে?

'তোর নামে ডাকাতির মামলা চলবো। সাজা না হওয়া পর্যন্ত জেলে থাকবি।'

'আমি তো ডাকাতি করি নাই।'

পুলিশ দুটি হেসে উঠলো, একজন বলল, 'সবাই তাই কয়। ট্যাকা পইশা আছে কিছু? থাকলে ক, আমার পরিচিত ভালা উকিল আছে। জামিন কইরা ফেলবো।'

ফজর আলী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলো তাদের মুখের দিকে।

সময়ের প্রবাহে এবং আদালতের কাঠগড়া মাড়াতে মাড়াতে ফজর বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। কারাগার থেকে আদালতে যাওয়ার সময় রাস্তায় মিছিল দেখতো। ছেলেগুলোর গলার রগ ফুলে উঠতো, তাদের মুখে কী অদ্ভুত এক তেজ দেখা যেত। ফজর গাড়ির ফাঁক দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখতো। একটা নাম সে প্রায় শুনতো, সেটা হচ্ছে, শেখ মুজিব। পুলিশদের জিজ্ঞাসা করতো, "ভাই কীসের মিছিল?

পুলিশরা প্রায় সময়ই কিছু বলতো না, অগ্রাহ্য করে অতি মনোযোগ সহকারে দাঁত খিলাল করতো। মাঝেমধ্যে কিছু পুলিশ উত্তর দিতো, 'ছাত্রদের মিছিল, সামনে নির্বাচন। শেখসাহেব ক্ষমতায় আসলে নাকি গরীবের উন্নতি হইবে। পুবের টাকা পশ্চিমে যাইবে না। পুবের মানুষ চাকরি পাইবে, জোয়াতদারী, জমিদারী বন্ধ হইবে, চাষীরা জমি পাইবে।'

মজিদের মুখ অকারণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তার ভবিষ্যত কাটবে জেলে, কিন্তু মজিদ, মজিদকে চুরি করে খেতে হবে না। ভাবতে ভাবতেই পাশের আরেকজন পুলিশ বলে উঠে, কচু হবে, সব ক্ষমতার ধান্ধা। বেয়াদ্দপ পোলাপাইন ইসলাম ধ্বংস করার জন্য নামছে, ভারত করাইতাছে এইসব। শুক্রবারেও মসজিদে গিয়া মাথা ঠেকায় না, আছে শুধু মিছিল লইয়া।

ফজর এতকিছু বুঝে না, তার স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে, ভালো লাগার মতো আর কিছু নেই তার। মানুষ যখন হতাশার চূড়ান্ত স্থানে পৌছে যায় তখন তার মনে আবার নতুন করে আশা জাগে। তখন সে স্বপ্ন দেখে, মনকে প্রবোধ দেয়। ফজরও ভাবছে তার মজিদ ভালোই আছে, আমেনা শক্ত মেয়ে, সে কোনো না কোনোভাবে ঠিকই সামলে নিয়েছে। কীভাবে নিয়েছে তা মজিদ ভেবে কূল পায় না কিন্তু তবুও মনে মনে সে বিশ্বাস করা শুরু করলো, মজিদ আর আমেনা ভালো আছে। মজিদ এখনো পাখির পেছনে দৌড়ে বেড়ায়, পেয়ারা গাছের ডালে এখনো ঝুলে থাকে, পুকুরে গোসল করতে করতে দুপুর পেরিয়ে যায়, তার মা তাকে ডাকে, 'ও মজিদ মুরগী জবাই দিছি, আলু দিয়া সালুন রানছি। আয় বাপ ভাত খাইয়া যা। সন্ধ্যাবেলা মজিদ বসে থাকে দাওয়ায়, তার মাকে বলে, 'মা বাজান

কবে আইবো। ফজর এখানে ভাবনার লাগাম টেনে ধরে। সে কবে যেতে পারবে? নিজের মনে প্রশ্ন করে যায়, কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

আজকে ফজরের মামলার রায়। জজসাহেব রায় দিলেন, কী দিলেন তা ফজর ছাড়া সবাই বুঝতে পারলো, কিন্তু কারো কোনো বিকার নেই। ফজর দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলো, কয় বছর?

পুলিশটি নির্বিকারভাবে বলল, "পাঁচ বছর, সাথে এক হাজার টাকা জরিমানা। দিতে না পারলে আরো ছয়মাস।'

ফজর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, সাড়ে পাঁচ বছর। ততদিনে মজিদ অনেক বড়ো হয়ে যাবে, তাকে কি তখন চিনবে? আমেনা কি অপেক্ষা করবে? কত প্রশ্ন আসে মনে। জেলখানার কথা মনে হতেই কেন যেন নিঃশ্বাস আটকে গেল ফজরের। সাড়ে পাঁচ বছর কীভাবে থাকবে সে।

৫

উঠান ঝাঁট দিতে দিতেই রাজ্যের চিন্তা ভর করলো আমেনার মনে। পেয়ারা গাছে ডাসা ডাসা পেয়ারা ধরেছিল-আমেনা বাদুড়, কাঠবিড়ালি থেকে বাঁচিয়ে পেয়ারাগুলো পেড়ে রেখেছে। মজিদ যখনই এসে বলে, ‘মা ভূখ লাগছে’-তখনি সে একটা একটা করে পেয়ারা বের করে দেয়। মজিদ এখন আর পেয়ারা খেতে চায় না; বলে, ‘ভাত খামু মা, আর গয়া খাইতে ভাল লাগে না। আজ তো পেয়ারাও শেষ, কী খাওয়াবে তাকে? ছেলেটা ক্ষুধা একেবারে সহ্য করতে পারে না। তখনি নজরে পড়ল তার অবশিষ্ট একমাত্র মুরগীটির দিকে। এটাও বেচে দিতে হবে, ডিম পাড়া মুরগী বেচতে মায়া লাগে কিন্তু উপায় কী। কেউ ভালো দামও দিতে চায় না। ফজরের পরিচয় এখনো ভোগায় তাদের।

কাজীসাহেবের বউ তো সেদিন বলেই বসলো, ‘মুরগী তোর নাকি আবার চুরিধারী কইরা আনছস?'

‘না গো মা, আমার জামাই চোর, বাপে চোর কিন্তু এই জীবনে আমি চুরি করি নাই।'

‘তা ক্যামনে কই? ঠিক আছে, এক জোড়া দুই টাকা দিমু।'

“কিন্তু মা, মুরগীর দাম তো আরো বেশি হয়।'

‘চোরের বউ থেইকা মুরগী কিনছি শুনলে কাজীসাবে এই মুরগীর মাংস দুইবোও না। তবুও আমি দয়া কইরা রাখতাছি, এইদামে দিলে দে।'

এভাবে আর কয়দিন থাকতে পারবে সে এখানে। রাতেরবেলা ঘরের পাশে খুটখাট শব্দ হলেও ভয় লাগে। যে নারীর স্বামী জেলে সমাজে তার অনিষ্টের শেষ নেই। শকুনেরা ডানা ঝাপটায় চারপাশে।

আমেনা ভাবলো, এই মুরগীটা বিক্রি করেই তার ভাইয়ের কাছে চলে যাবে। ভাই তাকে ফেলে দেবে না, দিতে চাইলেও পায়ে ধরে পড়ে থাকবে।

নিজের সামগ্রী বলতে তেমন কিছুই ছিল না আমেনার। মজিদের গুটি কয়েক জামাকাপড়, নাটাই, মুণ্ডুবিহীন ঘোড়া আর নিজের কিছু কাপড়চোপড় গুছাতেই পুটলিটা ভালোই বড়ো হয়ে গেল। অনেক পথ হাঁটতে হবে। গাছ কাটা একটা কচি লাউও সাথে

নিয়ে নিলো। আঁচলে বেঁধে নিলো তার সবশেষ সম্বল দুই টাকা চার আনা। ঘর ছেড়ে বের হওয়ার সময় কেন যেন বুকটা কেঁপে উঠলো। একবার মনে হলো, ক্ষান্ত দেয়, এ ঘরেই পঁচে মরবে। কিন্তু মজিদের দিকে তাকিয়েই উঠান ছেড়ে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। ভাবলো হুরমতিকে বলে যাবে, কিন্তু এই বিদায়ের সময় নতুন করে গঞ্জনা শোনার এবং পুকুর পাড়ে মহিলাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না।

***

মজিদ অধীর হয়ে উঠলো, তার ছোটো দুটি পা আর হাঁটতে পারছে না। রোদটাও বাড়ছে। গ্রাম থেকে গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে তারা। গ্রাম পেরিয়ে যাওয়ার সময় রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে কোনো কোনো গৃহিনী নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে, কোন গেরামের কুটুম্ব গো তোমরা, আহারে পোলাডা কাহিল হইয়া গেছে, পিড়ি পাইতা দেই, জল খাও।'

'জল' শব্দটা শুনেই আর অপেক্ষা করে না আমেনা। হিন্দুর বাড়ির পানিও খাবে না সে, ছোটোবেলা থেকেই চোর, মোল্লা, জমিদার, কেরানী কত দীক্ষাই পায়, সব দীক্ষা ভুলে যায়, কিন্তু ধর্মের গোড়ামীর দীক্ষা সহজে মুছে না। আমেনার বিধর্মী বিদ্বেষও তার নিজস্ব নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

গ্রামের হাড় জিরজিরে শিশুগুলো কুটুম্বের আশায় পথ চেয়ে থাকে, কুটুম্ব আসলে দুচারটে ভালো খাওয়া জুটে। আমেনা আর মজিদকে দেখেই অনেকে ছুটে আসে, কাছে এসে হতাশ হয়, না এটা তাদের কুটুম্ব নয়। যেই বাড়ির কুটুম্ব সেই বাড়ির লোকগুলোকে তাদের হিংসা হয়, আজ তারা পেট পুরে খাবে।

সূর্য যখন মাথার উপরে তখন তারা মোহাম্মদপুর পৌছালো, আমেনার ভাইয়ের গ্রাম। ভালোবেসে বাড়ি ছেড়ে বিয়ে করে এই গ্রামেই বসতি করেছিল সে। আমেনা আগে কখনো আসেনি। এক বাড়িতে গিয়ে ঘর লেপতে থাকা এক মহিলার কাছে জানতে চাইলো, "বাবুল মিয়ার বাড়ি কোনটা?

'কোন বাবুল মিয়া, ঘরজামাই বাবুইল্যা?'

আমেনা সম্মতিতে মাথা নাড়লো। মহিলার মুখভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে গেল, ঘর লেপা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি তার কে হও গো?

'আমি তার ভইন। আগে কোনোদিন আসি নাই, তাই চিনি না।'

মহিলা তখন মুখ কালো করে বলল, তুমি জানো না?

অজানা আশঙ্কায় আমেনার বুকটা ভারী হয়ে গেল। বলল, "কী?'

মহিলা হাত ধুয়ে বলল, "চলো।

বাবুল মিয়ার বাড়িটি নারকেল পাতার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেয়াল নিজের কর্মে ব্যর্থ। দেয়াল ভেদ করে রাস্তা থেকেই ঘরগুলোর জীর্ণদশা আর দরিদ্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভেতরে কিছু মোল্লা মৌলভী চাটাই পেতে বসে আছেন। তাদের মুখে দুপুরের রোদের মতো রাগের ছাপ।

একজন হাঁক ছেড়ে অন্দর মহলের উদ্দেশ্যে বলল, কই গো বাবুলের বউ? এমন অধর্ম তো আল্লায় মানবো না, বাবুলের লাইগা কি তোমার কোনো দয়া মায়া নাই?' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু আগত অপরিচিতা দেখে একটু থমকে গেল। পাশের মহিলা কে একজন জিজ্ঞাসা করলো, এটা কে গো বঁইচির মা?'

'বাবুইল্যার ভইন, মেলা দূর থেইক্যা আইছে।

মুরুব্বীরা খুশি হয়ে নড়েচড়ে বসেছেন, এবার একটা ব্যবস্থা হবে আশা করা যায়। আমেনা কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘরে ঢুকতেই দেখলো, একটি ছিন্ন বস্ত্রের মেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে আছে, তার শরীরের কাঁপুনি দেখে বলা যায়, সে নিঃশব্দে কাঁদছে। আমেনা কাছে গিয়ে মেয়েটির কাঁধে ধরলো। মেয়েটি উঠে তাকালো। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কোনো এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে, চোখেমুখে শুধু ধ্বংসস্তূপের ছাপ। শোক ছাপিয়ে ঘরে আসা অপরিচিত নারীর পরিচয় সম্পর্কে জানার কৌতূহলও তার চোখেমুখে ফুটে উঠার সুযোগ পেলো না। বইচির মা-ই পরিচয় দিলো, তোমার ননদ, বাবুইল্যার ভইন।

মেয়েটা যেন কান্না করার জন্য একটা কাঁধ পেলো। আমেনাকে জড়িয়ে ধরে, কাঁদতে লাগলো। এবার কান্নাটাকে শত চেষ্টা করেও শব্দহীন করতে পারলো না। আমেনা কিছুক্ষণ পরে বলল, ভাইজান কই?"

মেয়েটার কান্নার স্রোত যেন আরো বৃদ্ধি পেলো। বেড়ার ঘরের ছোটো জানালা দিয়ে বাড়ির পাশে নতুন খোঁড়া একটি কবরের দিকে তাকিয়ে আবার কাঁদতে লাগলো। আমেনা ফ্যালফ্যাল করে খেজুর পাতায় মোড়া নতুন কবরটির দিকে চেয়ে রইলো। বইচির মা-ও অকারণে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু আমেনার চোখ চৈত্রের মাঠের মতো খটখটে শুকনো। সৃষ্টিকর্তা তাকে দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিয়েছেন কিন্তু কান্না করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।

দুরন্ত যুবক ছিল বাবুল, আশেপাশের গ্রামে যাত্রাপালার দল এলে, তাকে আর কোথাও পাওয়া যেতো না, সে থাকতো যাত্রার দলের সাথে। মাথায় নকল চুল লাগিয়ে, শাড়ি, চুড়ি পরে ছোটোখাটো অভিনয়ও করতো। কাবাডি খেলে হাত ভেঙ্গেছিল একবার, ভারী কাজ সে করতে পারতো না। তাই যাত্রায় নাম লেখালো। যাত্রার দলও তাকে সাথে নিয়ে নিলো। সেবার দলের সাথে চলে এলো মোহাম্মদপুর। এখানেই সে দেখা পেলো শ্যামল বর্ণের চমকানো বিদ্যুতের মতো মেয়ে রোশনীর। বজ্রাহত হলো বাবুল সেই বিদ্যুতে। গরীব ঘরের মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়েতে আপত্তি করার দুঃসাহস দেখালেন না। কিন্তু আমেনার বাবা মেনে নিলেন না, মুখ কুচকে বললেন "ছিঃ ছিঃ আমার পোলায় চোর হইত ভালা হইত, কিন্তুক লাইন কইরা বিয়া করলো, ছিঃ।

বাবুল ঘর বাধলো শ্বশুর বাড়িতে, লোকে ব্যঙ্গ করে বলতো, ঘর জামাই বাবুইল্যা।' ঘর জামাই বাবুইল্যা তখন যাত্রা দলের সুন্দরী মোহিনী। কত পুরুষ তার প্রেমে পড়েছিল, রোশনী হাসতো, কালেভদ্রে হিংসাও করতো। মন খারাপ হতো যখন মোল্লা মুরুব্বীরা তিরষ্কার করতো। যাত্রায় এবার বড়ো ডাক পড়ল চট্টগ্রামে, অধিকারী অসময়ে দল নিয়ে ছুটলেন চট্টগ্রাম। ভালোই চলছিল তাদের পালা। কিন্তু একদিন রাস্তায় মিছিল হলো, বাবুল সর্বদাই মিছিলের পাগল। ছোটোবেলায় ঈদের চাঁদ দেখা গেলে মিছিল করতো দলবল নিয়ে, বিয়েশাদিতে, খেলায় জিতলে কারণে অকারণে মিছিলে চলে যেতো। মিছিল দেখেই গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিলো, মিছিলে ভিড়ে গেল। তার গলার প্রখরতা দেখে দুই একজন

তাকে সামনে ঠেলে দিলো। সে না বুঝেই চিৎকার করে উঠলো, “স্বায়ত্ব শাসন’ তার পেছনে শত গলা একসাথে বলে উঠলো, ‘দিতে হবে দিতে হবে। পেছনের গর্জন থামার আগেই, বন্দুকের গর্জন শোনা গেল। সামনে থাকা বাবুলের বুকেই বুঝি বিদ্ধ হলো প্রথম গুলিটি।

স্বামীর লাশ আনতেই রোশনীর সব জমানো অর্থ ফুরিয়েছে। হুজুর এসে বললেন, ‘বাবুইল্যা নাচ গান করতো, ছেলে হইয়া মাইয়া সাজতো, এলাকার পোলাপাইনের মনে কুচিন্তা ঢুকাইছে, তার দোযখ নিশ্চিত।

রোশনী ভয় পেলো, কান্না থামিয়ে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘উপায়?'

সমাধান দিলেন হুজুর, কোরান খতম দিতে হইবো, তিনদিনের দিন মোল্লা মৌলভীগো দিয়া মিলাদ পড়াইতে হইব। কিন্তু একবারও দক্ষিণা কিংবা ভুঁড়িভোজের কথা বললেন না। রোশনী মাথা কাত করে দিয়েছিল শুধু, হুজুর মৌলভীরা সকাল থেকে ঢুলে ঢুলে মিলাদ পড়েছেন, মোনাজাতে উচ্চস্বরে দোয়া করেছেন, যেন বাবুলের পাপ মোচন করলেন। কিন্তু তারপরে বসেই রইলেন। উনাদের দক্ষিণার কথা তুলতেই রোশনী মুখ লুকালো। সেই থেকে হুজুররা একটু পর পর তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, আর রোশনী মাটিতে পড়ে ফুলেফুলে কাঁদছে, স্বামীর শোকে আর নিজের অসহায়ত্বে।

আমেনা নিজের সম্বল থেকে দুই টাকা দিয়ে হুজুরদের বিদায় করলো। হুজুররা খালি মুখে যেতে চাননি, তাই মুখভরে অভিশাপ দিয়ে গেছেন, রোশনীকে। অর্থের তুলনায় দোয়া একটু বেশিই করে ফেলেছিলেন, তাই অভিশাপ দিয়ে সমতা বিধান করলেন।

আমেনার বলরামপুরের দরিদ্রতা, অসহায়ত্ব মোহাম্মদপুরে এসেও ঘুচলো না বরং বাড়লো। কিন্তু নিজের ছেলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে কোথা থেকে যেন অসুরের শক্তি ভর করে তার মনে, যতবার হোঁচট খায় ততবার যেন আঘাত নেয়ার শক্তি বেড়ে যায়, সাহস বেড়ে যায় সংগ্রাম করার। এই সংগ্রাম সে নিজ গৃহে করবে, এখানে তার ভাইয়ের তাজা কবর আর আবর্জনার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই। সকালে যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল সন্ধ্যায় বলরামপুরে সেই পরিচিত গৃহে এসেই তা শেষ হলো। সাথে যুক্ত হলো একটি অতিরিক্ত অনাহারী মুখ।

৬

জেলখানায় যারা বিড়ি সিগারেট খায় না তারা সাধারণত দুই ধরনের হয়, হয় ফেরেশতা নয়তো মৃত। ফজর আলী এই দুই ধরনের মধ্যে পড়ে না। তাই সে ভুস ভুস করে বিড়ি টানে, প্রথম প্রথম বিড়িতে টান দিলেই মাথা ঘুরাতো, কাশি আসতো প্রবল বেগে, এখন তেমন কিছুই হয় না। স্বাচ্ছন্দে ধোঁয়া ভেতরে যায় আর বের হয়। বিড়ির সাথে সাথে অন্তর পোড়র ধোঁয়া বের হয়। বিড়ির ধোঁয়া শেষ হয়ে যায় কিন্তু অন্তরের জ্বলুনি কমে না। তার সাজা হয়েছে তিনদিন হয়েছে, আরো কতদিন বাকি হিসেব করতে গেলে বুকে একটা ভারী কিছু অনুভব করে, চিৎকার করে কাঁদতে চায়। দম বন্ধ করে বসে থাকে, চোখ ফেটে অশ্রু নামে।

ইউসুফ মুন্সি এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় ফজরের। বিড়ি সিগারেট খায় না আবার মৃতও না ফেরেশতাও না, তৃতীয় প্রজাতির লোকটি হচ্ছে ইউসুফ মুন্সি। মাথায় সব সময় টুপি থাকে তার, প্রতি দুই তিন কথা অন্তর অন্তর আল্লাহর নাম নেয় সে। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। চেহারায় একটা কোমল আর পবিত্র ভাব আছে। এরকম লোকগুলো মসজিদের ইমাম হয়, তাদের দেখলেই মানুষ হাত তুলে সালাম দেয়। চোরডাকাত-খুনি-ধর্ষকে ভরা জেলখানায় ইউসুফ মুন্সি বড়ো বেমানান। ছয় বছর ধরে এই জেলখানায় পড়ে আছে সে, থাকতে হবে আরো চার বছর।।

ফজর আলী যখন প্রথম জেলে এসেছিল, তখন তার পরনে শুধু একটি লুঙ্গি ছিল, সেটাও জোয়ার্দারসাহেবের কামলা আর দারোগার কল্যানে স্থানে স্থানে ছিড়ে গিয়েছিল। নাদির গুন্ডার দেয়া এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে অনেক সুবিধাই আদায় করতে পারতো, কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে শুধু একটি কম্বল জোগাড় করতে পেরেছিল সে। গোসল করার সময় চৌবাচ্চার চারপাশে হুড়মুড়ে ভিড় লেগে থাকতো, সাকুল্যে গোসল করার জন্য একজন দুই মগ করে পানি পেতো। ফজর আলী ভেজা লুঙ্গি নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতো, লুঙ্গি না শুকানো পর্যন্ত। জেলখানায় ভয় আছে হিংসা আছে লোভ আছে কিন্তু মায়া নেই। ইউসুফ মুন্সি ছিল ব্যতিক্রম। তার মায়া হলো ফজরের উপর। দুইজন গার্ড

পুলিশকে বলে তার জন্য কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করে দিলো। পাশাপাশি গ্রামের নাম শোনার পর ইউসুফের মায়াটা যেন আরো বেড়ে গেল ফজরের প্রতি। সেই থেকে ফজর ইউসুফ মুন্সির সাথেই আছে। ইউসুফ ফজরের পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলো, “কী হইছে রে ফজর, কান্দস ক্যান?

'রাগে কান্দি হুজুর। আমি খারাপ মানুষ আমার সাজা হইছে, ঠিক আছে কিন্তু আমার বউ পোলা তো কিছু করে নাই। আমি এইখানে তিনবেলা খাওন পাই, তারা কী খায় কে জানে? কইলজাড়া ফাইট্যা যায় হুজুর। পোলাডার মুখটা মনে অইলেই ইচ্ছা করে সব ভাইঙ্গা পলাইয়া যাই।'

'রাগে মানুষের মাতা ঠিক থাহে না, ভালা মানুষ রাক্ষস হইয়া যায়। আমার রাগের লাইগাই আল্লায় আমারে এই জেলে ফালাইয়া রাখছে। হরমুজ বেপারীর পোলায় ভাং খাইয়া আমার বাড়িত আইসা মাতলামী করতো, আমি ঠেইল্যা টুইল্যা তারে বাড়িত পাঠাইতাম। একদিন দেহি তোর ভাবীরে জ্বালাইতাছে নেশা কইরা। মাথাত রক্ত উইঠ্যা গেল, রাগের মাথাত কী করছি মনে নাই। পোলাড়া দুই দিন পরে মরলো। উকিল কইছে আমারে, মিছা কতা কইলে এই মামলা থিক্যা খালাশ পাওন কোনো বিষয়ই না, কিন্তুক আমি এতবড়ো মিছা কতা ক্যামনে কই? আল্লায় ঠিক করছিল আমার জেল হইবো, হইছে। তুইও আল্লার ইচ্ছা মাইন্যা ল। আল্লায় তোর বউ পোলারে দেখবো। রাগ কইরা নিজের কপাল ভাঙ্গিছ না।'

ফজর আলীর বিশ্বাস ছিল, ইউসুফ মুন্সি কখনো মিথ্যা বলে না। আল্লাহর ভরসায় মনের দুঃখ তার একটু হলেও কমলো। সবার কাছে ইউসুফ মুন্সি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী ছিল না। তাদের মধ্যে সুজন মাস্টার অন্যতম। সুজন মাস্টারের সাথে ফজর হাজতে এক রাত কাটিয়েছিল, বিড়ির গন্ধে বমি করে দেয়া সুজন মাস্টারের চেহারার সামনে এখন সব সময় ধুমায়িত কুণ্ডুলি উড়ে। সেই ধোঁয়া এবং ডান দিকের ফাঁটা কাচের চশমা দিয়ে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখে পড়ে। তার সেই চাচা কিংবা প্রেমিকার বাবা তার নামে অপহরণের মামলা দিয়েছিল, মেয়েটি আদালতে এসে বলে গিয়েছিল, সুজন মাস্টার তাকে জোর করে ধরে

নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন খুব হেসেছিল সুজন। সেই ‘চাচা তার কথা রেখেছিল, সুজনকে জেলের ভাত খাওয়াচ্ছেন, এবং বেশ লম্বা সময় ধরে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করেছেন।

সুজন এতিম ছেলে, এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে মেট্রিক পাশ করেছিল। সারাজীবন মানুষের করুণা পেয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে তাকে করুণা করেনি, ভালোবেসেছিল। ভালোবাসা পেয়ে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সারাজীবন যা তার আরাধ্য ছিল তা হাত পেতে নিতে ভয় পাচ্ছিল, যদি হারিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছিল ভালোবাসার ভয়ে। মেয়েটিও চলল সাথে, সে বাধা দিলো, নীতিকথা শোনালো, ভয় দেখালো। মেয়ে কিছু বুঝলো কী না কে জানে শুধু বলল, তাকে না নিয়ে গেলে গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ডুব দেবে। সুজন মেয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের মান বিসর্জন দিয়ে হাত ধরে চলল অজানার পথে। তাদের জন্য যা অজানা মেয়ের প্রভাবশালী বাবার জন্য তা মোটেও অজানা নয়। তিনি ঠিকই তাদের খুঁজে বের করলেন, মেয়েকে দিয়ে স্বাক্ষী দেয়ালেন, তারপর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে পাঠালেন ভূইয়া বাড়ি আর সুজনকে পাঠালেন জেলে।

সুজন সেই থেকে বিশ্বাস হারিয়েছে, কাউকেই বিশ্বাস করে না সে নিজেকে ছাড়া। ইউনুস মুন্সিকে সময় পেলে অপমান করতেও ছাড়ে না সে। বলে, দাড়ি টুপির লেবাজ ধরলেই মানুষ ভালা হইয়া যায় না, যে খুন করছে সে খুনিই থাকে। মূর্খরা আপনার কথা কিছু না বুঝেই বিশ্বাস করে, আমি করি না।'

ইউসুফ মুন্সি মুখে হাসি এনে বলে, তোমার বয়সটাই এমন, এই বয়সে শয়তান মানুষরে রং দেখায়, ভুল বুঝায়। তোমরা ভুল কতা কও, তা তোমরা মানতে চাও না। তুমি কও শেখসাহেব ভালা মানুষ, দেশের মানুষের ভালা করবেন তিনি। আমি কই তিনি ভারতের দালাল, পাকিস্তানরে ভাঙার কুটচাইল খেলাইতেছেন। আমি রাজনীতি বুঝি না, কিন্তুক এই বুঝি যে ইসলাম ধ্বংস করার লাইগা ইয়াং ছাত্রগো লইয়া আইয়ুব সাবরে নামাইছেন শেখসাহেব।

সুজনের ভাঙা চশমার ফাক দিয়েও দেখা যায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, গলায় ঝাঝ এনে বলল, ‘তো আইয়ুব সাব তো নামছে, ইসলামের কী হইছে? ইসলাম ধ্বংস হইছে?

ইলেকশনে শেখসাহেব পাশ করলে পুবের মানুষ ভাত পাইবো, নাইলে আমরা ক্ষেতে খাটুম, তারা পেট ভরবো।

'এইসব তোমার কতা না, শয়তানের কতা। পাকিস্তানরে কেউ ভাঙ্গতে পারব না, বাঙালি দিয়া হইব না, দেশ চালাইতে লাগবো পাঞ্জাবি রক্ত। তারা আলিফ, বা, তা, ছা দিয়া লেহাপড়া করে, তাগো মনে ইলম আছে। আমরা বাঙালিরা নাফরমান, আলিফ, বা না পইড়া পড়ি সরু, সরায়া। এর লাইগা আমরার দেশের পুলাপাইন দুই পাতা পইড়া শয়তানের পাল্লায় পড়ে।

এক কোণে বসে থাকা বাচ্চু জোর গলায় বলে উঠে, 'আলবত। আপ ঠিক বলতা হায় হুজুর। বাচ্চু ভুল করে বাংলায় জন্ম নিয়েছে, অন্তত সে তাই বিশ্বাস করে। পাঞ্জাব সিন্ধু নিদেনপক্ষে বেলুচিস্তানে জন্ম হলেও তার আফসোস থাকতো না। করাচিতে এক পাঠানের ঘরে কাজ করতো বাচ্চু। ফুট ফরমায়েশ খাটতো, ভারী কাজ করে দিতো। মুগ্ধ চোখে সে দেখতো তাদের, কী গায়ের রং, কী পুরুষ্ট গোফ ছেলেদের, বুকের ছাতি কত চওড়া, লম্বায় যেন আকাশ ছোঁয়া। পুরুষদের রূপেই যে এত অবিভূত, নারীদের রূপ যেন তার কাছে স্বর্গীয়। একটাও কালো পাঞ্জাবি মেয়ে দেখেনি সে, ধনু বেপারীর মেয়ে ফর্সা বলে কত দেমাগ ছিল তার, অথচ এদের কাছে সে শ্যামলাই হবে। সে দুই মাস বাড়িতে টাকা না পাঠিয়ে পাঞ্জাবিদের মতো কাবলি বানালো। চালচলনে একটা খাটি পাকিস্তানি ভাব ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার চেহারাটা অতিরিক্ত বাঙালি। তবুও চেষ্টার কমতি ছিল না তার। মাটির রং ঘষে ঘষে কত ফ্যাকাসে হওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু যেই বাচ্চু সেই বাছুই রইলো। তার নামটাও বড়ো বাঙালি, সেজন্য নিজের বাবা মা কে কম অভিশাপ দেয়নি সে। চেহারায় না পেরে বোল চালে চেষ্টা করলো, উর্দুতে কথা বলতো সব সময়। কাবলি পরে হাঁটা চলায় বেশ অসুবিধা হতো তার, কিন্তু তবুও কাবলি ছাড়লো না, লুঙ্গি তার কাছে বাঙালি ছোটোলোকদের পোশাক। মাঝেমধ্যে রাস্তায় হোঁচট খেতো, শুধু মাত্র তখন বাংলায় মায়ের কথা মনে হতো, ও মাগো।' দোকান থেকে আসতে দেরি হলে, তার পাঠান কর্তা কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতো, রাস্তা মে উষ্ঠা খায়া।'

দোকানির সাথে তাল মিলিয়ে উর্দুতেই বাঙালিদের গালাগালি করতো, বাঙালি ফকিন্নী কা জাত হ্যায়।

সে নিজেকে সেই পাঠান পরিবারের সদস্য ভাবতে লাগলো, ভাবনাটা একেবারে তার নিজস্ব। কর্তা হাসি দিলে সে ভাবতো, 'ম্যায় নোকর নেহী, পাঠান হামার খালতো ভাই জেইসা হ্যায়। গৃহকর্তীকে সুযোগ পেলেই 'ভাবীজান' বলতো। গৃহকর্তী হয়তো শুনেওনি, সে ভাবতো, "ম্যায় ভাবীজানের দেওর জেইসা হ্যায়। এরকম ভাবনা তার মনে দিনে দিনে বহুগুণে বৃদ্ধি পেলো। একদিন খুব ক্ষুধা পেলো, কিন্তু অন্দরমহল থেকে খাবার আসার কোনো নাম নেই, সে তখন এক কুলক্ষণে আবার ভাবলো, 'ম্যায় ঘর কা আদমি, ভিত্রে গিয়া খানা চাই, ভাবীজান ভুল গ্যায়া মনে হয়।' 'ঘর কা আদমি বাচ্চু ঘরে ঢুকে বৈঠকখানার ভেতরে উঁকিঝুকি দিতে লাগলো। তখনি পাঠান ঘরে ঢুকলো, চাকরের স্পর্ধা দেখে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। শক্ত হাতে ঘাড়ে ধরে বাহিরে এনে ফেলল। পেশীবহুল হাতুড়ির মতো হাত দিয়ে মারতে মারতে বলল, 'শালা বাঙালি চোর, চুরি করতা হ্যায়।'

বাচ্চু প্রথমে বুঝানোর চেষ্টা করলো, "ভাইজান, ভাইজান আপ গলদ বুঝতাছেন। হাম চোর নেহি হু। তারপর মারের চোটে অজ্ঞান হবার আগ পর্যন্ত চেঁচাতে লাগল, ও মাগো, ও মাগো।

'ভাইজানের ঘরে চুরির অভিযোগে তার জেল হয়। পূর্ব বাংলার জেলে দিয়েছে বলে সে একটু নাখোশ। তবে ইউসুফ হুজুরকে তার ভালো লাগে। ইউসুফ হুজুর পাকিস্তানিদের পক্ষে কথা বলে। বাচ্চুর উর্দু বলার ভূত পাঠানের প্রহারেও তাকে ছেড়ে যায়নি। পাকিস্তানের গল্প তার কখনো শেষ হয় না। খেতে বসলে গোগ্রাসে কঙ্কর মিশ্রিত ভাত গিলতে গিলতে বলে, 'ভাত হজম নেহি হোতা হ্যায় ম্যারা। ভাত থিক্যা রুটি আচ্ছা।'

পাকিস্তানের খাবার কতো মজার, ফলের দাম কত সস্তা, রুটি খাওয়ার বিবিধ উপকারিতা বর্ণনা করতো সে। কিন্তু রুটি খেয়ে যে তার বাঙালি পেটে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল তা কখনো বলে না। রাজনীতির কথা সে বিশেষ বোঝে না, কিন্তু পাকিস্তানিদের প্রশংসা করলেই, সে বলে উঠবে, 'আলবৎ।'

আজও তাই করলো। ফজর আলীও কিছু বোঝে না, তারা বলে আইয়ুব, সে মনে মনে ভাবে, মজিদ। তারা বলে শেখ মুজিব, সে মনে মনে ভাবে, আমেনার কথা। তার কপালে দুশ্চিন্তার দুটি স্থায়ী ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল, তার বউ আর ছেলের জন্য।

সন্ধ্যার ঘণ্টা পড়া মাত্রই তারা লাইন ধরে বসে যায়, তিনবার করে গোনা হয়। তারপর ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে যায় তারা। ফজর ভাবে সন্ধ্যা হলেই আমেনা কীভাবে 'হুস হুস' করে হাঁস-মুরগি খোয়াড়ে ঢুকাতো। মজিদ দুপুরের গোসলের সব কৃতিত্ব গাছে উঠে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বিসর্জন করে দিতো। আমেনা হাঁস-মুরগীর রাত্রী নিবাসের ব্যবস্থা করে, মজিদকে পুকুর পাড়ে নিয়ে গিয়ে আবার মানুষ করে নিয়ে আসতো। কুপিতে কেরোসিন ভরে, সলতেটা টান দিয়ে উপরে তুলে আগুন জ্বালাতো। ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ত। সেই মায়াবী সন্ধ্যায় আমেনার কঠিন মুখেও কী অদ্ভুত কোমলতা ফুটে উঠতো। ফজর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে থাকে। যতবার ভাবে নতুন কিছু স্মৃতি যোগ হয় সেই সন্ধ্যায়। আর সে ততই ব্যাকুল হতে থাকে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়, দেশে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে নির্বাচনের উত্তাপ যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। হতাশ দরিদ্র মানুষগুলোর অন্ধকার বুকে একটু আশার রেখা দেখা দিয়েছে, এবার কিছু একটা হবে। কারাগারেও কিছুটা উত্তাপ লেগেছে। প্রায়ই বাকবিতণ্ডা হচ্ছে, একপাশে শোর উঠে শেখসাহেব, আরেকপাশে কিছু ম্রিয়মান কণ্ঠ গোলযোগ করে বলে, ভুট্টো সাব। ফজর আলী সেই, শোর কিংবা গোল কিছুতেই নেই।

সকাল পাঁচটা বাজেই তালা খুলে দেয়া হয় সেলের। সবাই হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে যায়, গরমকালে চৌবাচ্চার দিকে ছুটে, সারারাত ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হয়ে, সকালে একটু ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ লাগাতে চায় সবাই। এখন শীতকাল চৌবাচ্চায় তেমন ভিড় নেই, তবুও সবাই আগের মতোই সেল থেকে বের হওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে। একবার গণনা করার পর সবাইকে প্রাকৃতিক কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। সারিবদ্ধ শৌচাগারের সামনে লাইন ধরে সবাই, দূর্গন্ধময় সেই শৌচাগারে ঢোকার জন্য আকুলি বিকুলি করে। আবার ঢুকলে বের হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। বাচ্চু মিয়া ঢুকেছে কিন্তু বের হওয়ার নাম নেই, পাকিস্তানি রুটির প্রভাব এখনো শেষ হয়নি তার। বাহির থেকে ততক্ষণে বাচ্চুর চৌদ্দ গুষ্ঠী

উদ্ধার হচ্ছে, সবগুলো গালাগালি যদি সত্য হতো, দুনিয়াব্যাপী বাচ্চুর আত্মীয়স্বজন থাকতো। আত্মীয়ের পরিমাণ আর না বাড়িয়ে বাচ্চু বিরস মুখে বেরিয়ে এলো। সবাই যখন একজোট হয়ে রোদ পোহাচ্ছে, অথবা শৌচাগারের সামনে গালির অনুশীলন করছে, তখন একটি লোক একপাশে চাঁপা গাছটার নিচে বসে বিড় বিড় করে কী যেন বলছে, ফজরের ধারণা সুরা পড়ে হয়তো। তার চেহারায় একটা সম্ভ্রান্ত ভাব আছে, মাথার চুলগুলোতে পাঁক ধরেছে, একসময় ঘন কালো কোঁকড়া চুল ছিল বলা যায়, চামড়া তামাটে রঙের নয়, বাদামী, তবে একসময় বেশ ফর্সা ছিল। লম্বা শরীরটাতে বাল্যকালের অপুষ্টির চিহ্ন নেই, এখনো সুগঠিত বলা যায়। ফজর আলী ইউসুফ মুন্সিকে জিজ্ঞাসা করলো, কে গো ভাই এই বালা মাইনষের পোলা?

‘নাম তো জানি না রে, তয় সবাই কয় পাগলা পফেসর। বড়ো কোনো কলেজের মাস্টার আছিল। বাপের বহুত ট্যাকা পইসা আছিল। খুন কইরা জেলে আইছে।'

‘কারে খুন করছে?

‘জানি না, কারো লগে কতা কয় না, একলা একলা থাহে। বইটই পড়ে। সুযোগ পাইলেই চাপা গাছটার নিচে বইয়া থাহে। কেন জানি সবাই ভয় পায়, তুই কাছে যাইস না।'

ফজর আলী লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ‘পাগলা পফেসর’ এর চোখ দুটি যেন জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দুটি নিরীহ কয়লা, একেবারে নির্বীষ কিন্তু পেছনে রয়েছে অনেক জ্বালা।

***

সকালে নাস্তা হিসেবে সেই আখের গুড় আর শুকনো খড়খড়ে রুটি। চিবিয়ে চিবিয়ে মাড়ি ধরে যায়। তারপরও কেউ একটা কণা ফেলে দেয় না। দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে হবে কচু ক্ষেতে। এই সময়টার অপেক্ষায় থাকে সবাই, আবার এই সময়টাকেও ভয়ও পায়। চার দেয়ালের বাহিরে আসা যায়, মুক্ত মানুষের চলাচল দেখা যায়। বাহিরের কারো সাথে কথা বলা নিষেধ, রাইফেল হাতে চারজন পুলিশ সবসময় পাহারায় থাকে। মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেয়ার সৌভাগ্য হয়, কিন্তু কচু ক্ষেতের পঁচা কাদাতে পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা হয়ে যায়। 'ঝুঁকে কাজ করতে করতে কোমরে খিল ধরে যায়, প্রচণ্ড রোদে পিঠ পুড়ে যায়, দরদর

করে ঘাম নামে, গায়ের ডোরাকাটা পোশাকটি ভিজে চপচপ করে। দুপুর হতে না হতেই ক্ষুধায় পেট আর মাথার মধ্যে ভো ভো করে। ফজর আলী একজন ছোকরা পুলিশের দিকে তাকিয়ে কাকুতি করে, ও বাইজান, কইলজা হুকায়া গেছে, একটু পানি খাইতে দেন।

'জি ছ্যার, আর কিছু লাগবো? কোরমা, পোলাও? তালপাতা দিয়া একটু বাতাস কইরা দেই?

'একটু পানি দেন, হাশরের ময়দানে আল্লায় আফনেরে পানি দিবো।

পুলিশটি তার রাইফেলের বাট দিয়ে ফজরের পিঠে জোরে আঘাত করে। তারপর খেকিয়ে বলে উঠে, 'শালা চাকর পাইছস, তোগো সেবা করার লাইগা খারাইছি? কাম কর।'

ফজর বাড়ি খেয়ে কাদা পানির মধ্যেই ছপ করে লুটিয়ে পড়ল, পিঠে তীক্ষ একটা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখলো সব ঝাপসা হয়ে আসছে, অস্পষ্টভাবে রাস্তায় যেন মজিদকে দেখতে পেলো সে। দূরে কেউ যেন ডেকে উঠলো 'বাজান' বলে। কাদা মাখামাখি হয়ে যাওয়া ফজরকে ধরে একপাশে নিয়ে আসলো ইউসুফ মুন্সি। বেশি জোরে মেরে ফেলেছিল ছোকরা পুলিশটি। এখন বেচারার একটু খারাপই লাগছে, কিন্তু মুখে সে খারাপ লাগা বিন্দুমাত্র প্রকাশ না করে, পাশেরজনকে তাচ্ছিল্যভরে বলল, দেহেন তো ভাই মরছে নাকি? পানি-টানি দেন তো।

কাজে ফাঁকি দেয়ার ছুতা পেয়ে সবাই ঘিরে ধরলো ফজরকে, বাচ্চু এগিয়ে এসে বলল, 'লাগতা হ্যায় মর গ্যায়া।'

দুই একজন এগিয়ে এলো, মরে গেলে বেশ ভালো হয়, একটা হট্টগোল হবে। একঘেঁয়ে জীবনে একটু ঝামেলা হলে সেটা উপভোগ্যই হবে, বিশেষ করে ঝামেলাটা যদি হয় পুলিশ পক্ষের। সুজন মাস্টার নাড়ি ধরে বলল, "নাড়ি তো টের পাই না। হায় হায় মরলো নাকি?

মৃত্যুপ্রত্যাশীদের মুখ উজ্জ্বল হয়, ইউসুফ মুন্সি ডান হাতের আঙুলের ডগায় পানি নিয়ে ফজরের মুখে ছিটাতে থাকে সাথে বিড় বিড় করে দোয়াও পড়ছিল। ছিটানো পানির কল্যাণে অথবা দেয়ার জোরে ফজর ধীরেধীরে চোখ মেলে। মৃত্যুপ্রত্যাশীরা হতাশ হয়,

সবাই কাজে ফিরে যায়, কিন্তু ফজরকে আর কাজ করতে হয়নি। সে ক্ষেতের আইলে একটি বড়ো লেবু গাছের তলায় বসে ছিল। অজ্ঞান হওয়ার আগে সে মজিদকে দেখেছিল, “বাজান' ডাক শুনেছিল। আরো একবার ছেলেকে দেখার জন্য, ছেলের ডাক শোনার জন্য, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

খালি পেটে ঘুমানোর অভ্যাস আমেনার আছে, কিন্তু রোশনীর নেই। তার চোখ এখনো শুকায়নি, সুযোগ পেলেই এখনো চোখ ভেজায়। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস একটু পরপর যেন চাবুক মেরে যাচ্ছে। বাঁশের বেড়া সেই ঠাণ্ডা ভয়ানক বাতাস আটকাতে পারছে না। মজিদকে মাঝখানে রেখে আমেনা আর রোশনী দুই পাশে শুয়েছে। হেঁড়া একটা কাঁথা শীত নিবারণ করতে পারছে না। আমেনাও এই শীতে ঘুমাতে পারছে না। মজিদের গা'টা একটা চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। নাকেমুখে বাতাসের ঝাপটা লাগতে পারে, তাই নিজের আচঁল দিয়ে মজিদের মুখটা ঢেকে দিয়েছে সে। রোশনী নিঃশব্দে কান্নার চেষ্টা করছে কিন্তু মাঝেমধ্যে নাকের ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দ হচ্ছে। আমেনা বিরক্ত হয়ে বলল, "এতো কান্দ কেন? কানলে কি জামাই ফিরা পাবা নাকি কপালে ভাত জুটবো?'

রোশনী আঁচল দিয়ে ফ্যাত করে নাক মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "কী করুম কও, কানলে খাওয়া জুটতো না, না কানলেও তো জুটতো না। কাইন্দা মনডারে ভাইল দেই। বইন ঘরে বইয়া থাকতে আর মন চায় না। কাইল কাজী বাড়িত ধান বানতে গেলে আমারেও নিও।'

"ধান ভানা শেষ।

'কও কী? ধান না ভানলে চাই বা কেমনে? আমরা খাইয়া না খাইয়া তো আছিই, পোলাডা খাইবো কী?'

'জানি না গো বইন। হেলেঞ্চা টুকাইয়া আইনা হিজাইয়া দুইটা ভাত পোলাডারে খাওয়াইতাম, কিন্তুক কাম না থাকলে কী করুম? ভীক্কা করতে অইবো নাইলে গতর বেচতে হইবো। চোরের জোয়ান বউরে কেউ ভীক্কা দিব না, গতর দিলে ঠিকই নিবো। গঞ্জে নাকি বেশ্যাঘর আছে, হেদিকে যামুগা।'

রোশনী ভাবলো, তার ননদ বেশ্যা হবে? তার নিজের ভাগ্যও হয়তো তাই। শোকে কাঁদছিল এতক্ষণ, আশঙ্কায় সে কান্না থেমে গেল, বুকটা কেঁপে উঠলো, সে আর কোনো কথা বলল না।

ভোর হয়েছে কেবল, সূর্য তখনো উঠেনি। উঠলেও কুয়াশা ঠেলে রোদ পৌছাতে পারেনি। মোরগের ডাকে আমেনার ঘুম ভাঙ্গলো, মোরগের নাম হুরমতি। হুরমতি শেষ রাতে উঠে পড়ে, আমেনার পিন্ডি চটকিয়ে দিন শুরু করে এখন। হুরমতির গলার সাথে আরেকটা শব্দ পাওয়া গেল, ঠক ঠক শব্দ, কাঠ কাটার শব্দ। আমেনা হুড়মুড়িয়ে উঠলো, কাঠ কাটে কে? বাহিরে এসে প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া একটা ধাক্কা দিলো যেন, ঠাণ্ডায় আমেনা হাত পা গুটিয়ে এতটুকুন হয়ে গেল। কুয়াশার ভেতর ঢুকে গেল সে, বাশঝাড়ের কাছ থেকে শব্দটা আসছে। কাছে গিয়ে দেখলো, একটা মেয়ে কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে, কুড়াল দিয়ে বাঁশ কাটছে। আমেনা কাছে গিয়ে সেই মেয়েকে চিনতে পারলো, রোশনী। আমেনা কাছে গিয়ে বলল, “কী করো ভাবী?'

রোশনী বাঁশে কুড়াল দাগা থামিয়ে জোরে শ্বাস টেনে বলল, “গতর বেচতে হইব না, গতর খাইটা কাম করুম।

***

মোহাম্মদপুর গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা হচ্ছে ‘ছইয়াল’। খুব উচ্চবিত্ত ছাড়া টিনের ঘর দেখা যায় না, সবাই বাঁশ অথবা পাটকাঠি দিয়ে ঘর বাধত। বাঁশের বেড়াই বেশি চলে। মোহাম্মদপুরের শিশুরা কথা বলতে শেখার আগেই বাঁশের কাজ শিখে যায়। বাঁশ দিয়ে চাটাই বানায়, মাছ ধরার চাই বানায়, ঝুড়ি বা ডুলা বানায়, ওড়া বানায়। রোশনীও সেই বিদ্যা ভুলে যায়নি। আমেনা উচ্ছসিত হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো, কী যেন মনে পড়ে গেল। রোশনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবী বাঁশ কাইটা ওড়া বানাইবা, কিন্তুক কিনব কেডা? বেচতে হইলে গঞ্জে লইয়া যাইতে হইবো।'

‘আমি লইয়া যামু গঞ্জে।

‘মাইয়া হইয়া গঞ্জে যাইবা? মাইনষে নানান কতা কইবো।'

‘গতর বেচার লাইগা বেশ্যা হইয়া গঞ্জে যাওনের থেইকা ওড়া, ডুলা বেঁচতে গঞ্জে যাওন ভালা। কে কী কইবো পরে দেহন যাইবো। মাইনষের কতা দিয়া পেট ভরত না।'

‘তুমি একলা যাইবা?

'না আমার লগে একজন পুরুষ মানুষও যাইবো।'

আমেনা ভ্রু কুঁচকে রোশনীর দিকে তাকায়, রোশনী হেসে উঠে গা দুলিয়ে। হাসি থামিয়ে বলে, 'ডরাইও না গো ননদ, মজিদরে লইয়া যামু।'

ভোরবেলা ঘন কুয়াশার মধ্যে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। কেউ মাঠে, কেউ ঘাটে, কেউ আবার হাটে। উপরের দিকে তাকিয়ে তারা রোদের অপেক্ষা করে, তাদের চিট পরা ছেড়া ময়লা কাপড়ে শীত ঢোকার জন্য যথেষ্ট ফাঁকফোকর পেয়ে যায়। রোশনী তার আঁচলখানা বেশ ভালো করে গায়ে মুড়িয়ে নিয়েছে তার মাথায় ওড়ার বোঝা, তার উপর বাঁশের চাটাই আর কিছু ঝুড়ি। মজিদও তার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে, তার গায়ে চটের বস্তাটি ভালো করে জড়িয়ে দিয়েছে আমেনা। মজিদের মন খুব ভালো, গঞ্জে যেতে পারলেই তার ভালো লাগে, অতি উৎসাহে হেঁটে সে মাঝেমধ্যে রোশনীকে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। রোশনী এক হাতে মাথার ঝাকাটা ধরে অন্যহাতে মজিদের হাত ধরলো।

বলরামপুর গ্রাম আর গঞ্জের মাঝখানে একটা ছোটো নদী আছে, নাম কালী নদী, তারা বলে কালী গাঙ। নদীর পানি চোখের মণির মতো কালো। অনেকে বলে এটা আসলে খাল ছিল, অনেক আগের এক জমিদার এই খাল কেটেছিল, মা কালী নাকি তাকে স্বপ্নে বলেছিল। সেই খালই নাকি এখন নদী হয়ে গেছে। কালী নদী নামের পেছনে 'দেবী' নাকি 'কালো পানি' কোনটার ভূমিকা আছে তা স্পষ্ট নয়। নদী থেকে ভোরবেলা গরম পানির মতো ধোঁয়া বের হচ্ছে। রোশনী কালী গাঙের পাড়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এখন কীভাবে নদী পার হবে? হঠাৎ নদীর পানির উপর ভেসে থাকা কুয়াশার কুণ্ডুলি থেকে একটা নৌকা বেরিয়ে এলো। নৌকার অপর প্রান্ত এখনো ধোয়াটে। মাথায় গামছা বাধা, বয়স ত্রিশের এক লোক হাঁক ছাড়লো, 'উইঠ্যা পড়ো গো মনা, পার কইরা দেই।'

মাঝিটি বোধহয় রোশনীকে দেখতে পায়নি, মজিদকে দেখেই এই সম্বোধন। রোশনীকে দেখেই একটু চমকে গেল, লজ্জাও পেলো। রোশনী আর মজিদ নৌকায় উঠে বসলো। মাঝি আড়চোখে তার যাত্রীদের কিংবা নারী যাত্রীকে দেখে নিলো। তার দীনতা মলিন শাড়িতেই প্রকাশ পায়, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এলোমেলো চুল বেরিয়ে পড়েছে, চুলে তেল

চিরুনীর স্পর্শ পড়ে না অনেকদিন। তবুও এই শ্যামবর্ণ নারীটি যেন কালী গাঙের মতোই। শীত গ্রীষ্মেও কালী নদীর পানি শুকিয়ে যায় না, পানি কালো কিন্তু স্বচ্ছ। এই মেয়েটিও যেন তাই, স্বচ্ছ। রোশনী চোখ তুলতেই মাঝির সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। মাঝি আবার লজ্জা পেলো, বৈঠা চালিয়ে পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্যই বলল, 'আপনারে আগে দেখি নাই কুনোদিন, কুটুম নাকি?'

রোশনী মাথার ঘোমটাটা আরেকটু টেনে দিয়ে বলল, 'কুটুমও কইতে পারেন, আমার ননদের লগে থাকতে আইছি, কয়দিনের লাইগা আইছি জানি না।'

রোশনী মনে মনে নিজেকে অভিশম্পাত দিলো, অপরিচিত জোয়ান মাঝিকে এতকিছু কেন বলতে গেল সে, কিন্তু মাঝির কথায় এবং চোখে এত সারল্য যে আপন ভেবে সব কথা বলে দিতে ইচ্ছা করে। মাঝিটি মজিদের দিকে ইশারা করে বলল, 'আপনের ছাওয়াল?

রোশনী এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'না।'

ছোটো নদী পার হতে বেশি সময় লাগলো না। পাড়ে ধাক্কা খেয়ে নৌকা থেমে গেল। মাঝি বলল, 'দশ পাই (পয়সা) কইরা একজন, দুইজনে বিশ পাই।'

রোশনী চুপ করে বসে আছে, কিছুক্ষণ পরে বলল, 'পইসা তো নাই মাঝি, গঞ্জে ওড়া ঝুড়ি বেঁচতে যাই, মাদাইন্যা বেলা আবার যামু তহন পইসা দিমুনে।'

মাঝি চমকে উঠলো, পয়সার জন্য নয়, এই মেয়ে গঞ্জে যাচ্ছে সেটা ভেবেই মনটা আঁতকে উঠলো। তার গঞ্জে যাওয়ার প্রয়োজন কী? স্বামী নাই? ভাই নাই? গঞ্জে যে পুরুষ আর বেশ্যা ছাড়া কেউ যায় না।

গঞ্জে ঢুকার রাস্তাটাতে অনেক মানুষজন আসা যাওয়া করছে। এখানে কিছু ভিখারিনী বসে আছে, লোক দেখলেই হাত পেতে চেঁচাচ্ছে, কোলের বাচ্চাকে চিমটি দিয়ে কাঁদাচ্ছে। দুই-একজন বিরক্তি ভরা মুখে পাঁচ পয়সা ছুড়ে দিচ্ছে। পাঁচ পয়সার বিনিময়ে কিছু পুণ্য আয় করে অনেকে তৃপ্ত হয়। রোশনীকে দেখে একজন এগিয়ে এলো, একটু আগেই করুণ মিনতি করছিল সে। যখন কথা বলল, তখন রোশনীর বিশ্বাস হচ্ছিলো না একটু আগে

এই বৃদ্ধাই করুণ সুরে ভিক্ষা চাইছিল। বৃদ্ধা গলায় বেশ তেজ এনে বলল, এইদিকে বসন যাইবো না, অন্যদিকে বসো গা। জোয়ান মাগী আইছে ভিক্ষা করতে, জ্বালায় বাচি।'

রোশনী একটু সময়ের জন্য হতভম্ভ হয়ে গেল সম্ভবত বৃদ্ধার সুর পরিবর্তনে। সে নম্রভাবে বলল, "ভিক্ষা করতে আইনাই গো কাকী। বেচতে আইছি।'

বৃদ্ধা কোমর নাচিয়ে রোশনীর কথার সুর নকল করে বলে উঠলো, 'বেচতে আইছি! জোয়ান মাগি আইছে গঞ্জে বাণিজ্য করতে। যাও গঞ্জের উত্তর দিকে যাও, হেদিকে ভালা বেচাকিনা হয়।'

'উত্তরদিকে কী গো কাকী?'

'বেশ্যাঘর।'

রোশনী চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'বেশ্যাঘর তো ভালাই চিনো, জোয়ানকালে কী হেদিকেই আছিলা?' বলেই হনহন করে হেটে গঞ্জে ঢুকলো। পাতলা কয়েকটা দোকানঘর আছে এদিকে, কিছু লোক দোকানগুলোতে সদাই করছে, নাপিত বসেছে একজন পিড়ি পেতে। শসা, লাউ, কুমড়া নিয়ে দশ বারো বছরের একটা ছেলে বসে আছে খদ্দরের আশায়, তার বিষন্ন মুখ দেখে বুঝা যায় এখনো কিছু বিক্রি করতে পারেনি। গাছে পেরেক গেঁথে একজন লোক খালি গায়ে চিটমিঠাই বানাচ্ছে। রোশনীকে দেখে সবার কাজে যেন স্থবিরতা চলে এলো, এক মুহূর্ত সব চাঞ্চল্য বন্ধ হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে রোশনীকে দেখছে কিছু লোক, গঞ্জে যেন সব মেয়েকে এভাবেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, পাতলা ছেড়া শাড়ির ভেতরে চোখ গেঁথে রেখেছে তারা। রোশনী ঘোমটাটা আরো টেনে আঁচলটা দাঁতে চেপে রাখলো। ভেতরে মনে হয় মূল হাট বসে। সেখানে পুরুষ মানুষে গিজগিজ করছে। রোশনীর সাহস হলো না ভেতরে যাওয়ার। কোমর থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দশ বারো বছরের ছেলেটির পাশে গিয়ে রাখলো, সেখানেই খুলে বসলো তার ভ্রাম্যমান দোকান।

ঘোমটার আড়ালে লোকের চক্ষু সে ঠিকই দেখলো, কিন্তু কারো চোখে চোখ রাখলো না। গাছের ফাক দিয়ে গলে পড়া এক টুকরো রোদে মজিদকে বসিয়ে দিলো, নিজে বসলো একটু তফাতে। সকালের আড়ং প্রায় শেষ, মানুষজন দলে দলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

রোশনীকে বসে থাকতে দেখেই ফিসফাস শব্দে আলোচনা হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় জটলা বেঁধে গেছে। একটা মেয়ে মানুষ গঞ্জে এসেছে, দোকান খুলে বসেছে, এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। কেউ গিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু কিনছে না, কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না। মজিদের গায়ে পড়া রোদটা ঢেকে গেল, মেঘের মতো একদল লোক জটলা বেঁধেছে তাদের সামনে। মুরুব্বী গোছের এক লোক মজিদকে বলল, “ঐ পোলা তর মারে ক, এই গঞ্জে কেউ জেনানাগো কাছ থেইক্যা কিছু কিনবো না। এইডা জেনানাগো জায়গা না, তাগো জায়গা ঘরে।

মজিদকে কিছুই বলতে হলো না, রোশনী সবই শুনেছে। সে নড়লো, ঠায় বসে রইলো মাথা নিচু করে। মুরুব্বী এবার আর মধ্যবর্তী মাধ্যম ব্যবহার না করে রোশনীকে সরাসরি বলল, ‘এদিকে বুইয়া থাইক্যা লাভ নাই, ঘরে যাও।'

ঠিক তখনি ভিড়ের মধ্য থেকে একজন সুঠাম দেহের পুরুষ এগিয়ে এলো, এখানের আলোচনা, পরিস্থিতি তোয়াক্কা না করে, সে মজিদকে জিজ্ঞাসা করলো, ঐ ছ্যাড়া ডুলাডার দাম কতো?

সবগুলো চোখ বিস্ময়ে লোকটার দিকে ঘুরে গেল, রোশনীও ঘোমটার ফাক দিয়ে এক দফা দেখে নিলো, লোকটার হাতে বৈঠা, সেই কালী গাঙের মাঝি। মজিদ ডুলার দাম জানে না, সে বলল, 'একশ টাকা।

দাম শুনে ভিড়ের মধ্যে একটা হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল। মুরুব্বীর চোখ কেমন সরু আর মুখ শক্ত হয়ে গেল, একটু আগের গম্ভীর, ক্রুদ্ধ মানুষগুলো এখন হাসছে। সে রুক্ষ গলায় বলল, “হাসো হাসো, শয়তানে আছর করছে তোমাগো।'

তার কথাটা হাসির মধ্যে হারিয়ে গেল। মুরব্বীর চোখে আগুন ধরে গেল, হনহন করে চলে যাওয়ার সময় মাঝির দিকে তাকিয়ে বলল, “নসু তোর বেয়াদ্দপি দিন দিন বাড়ছে, মনে রাখিছ।'

নসু তার মুখে হাসি ধরে রেখেই বলল, “আইচ্ছা, সালিশ বসাইয়া খবর দিয়েন, আমি চইলা আসুম।

এতক্ষণ পর রোশনী মুখ খুলল, বলল, ‘ডুলার দাম চাইর আনা।' নসু মাঝি লুঙ্গির খুট থেকে চার আনা বের করে দিলো। রোশনী বলল, ‘লাগবো না, এমনেই আপনের করজদার।'

নসু একটি ডুলা হাতে নিয়ে, মজিদের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে কিছু বলে হাতে বৈঠা ঘুরাতে ঘুরাতে চলে গেল। রোশনী তাকিয়ে থাকলো, চোখ ভিজে এলো তার।

পড়ন্ত দুপুরে রোশনী আর মজিদ কালী নদীর ধারে পৌছালো। দু আনার বাতাসা মুড়ি কিনেছে রোশনী, তারই খানিকটা আঁচলে রেখে চাবাচ্ছিলো, মজিদও আঁচলে হাত দিয়ে মুড়ি কম বাতাসা বেশি খাচ্ছিল। নৌকায় খালি গায়ে নসু মাঝি বসে ছিল, এই সময় তার যাত্রীদের আকাল থাকে, তাই বাড়ি চলে যায়। আজ থেকে গেল, সম্ভবত রোশনী আর মজিদের অপেক্ষাতেই। কালী গাঙের মাঝি নসুর শরীরটাও কয়লা কালো, কিন্তু চোখদুটোতে মায়া ভরা। কয়লার মাঝে যেন জ্বলজ্বল করা দুটি হীরকখণ্ড। এই প্রথম মাঝির চোখে চোখ রেখে হীরকখণ্ড দুটো আবিষ্কার করলো রোশনী। লজ্জায় কিংবা কৃতজ্ঞতায় চোখ নামিয়ে নিলো। আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে গিয়ে খেয়াল করলো, তা মুড়ি দখল করে নিয়েছে, লাজুক মুখে এলোচুলে দাঁড়িয়ে রইলো সে। নসু মাঝি কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলল, ‘ভালা বাণিজ্য হইছে, এইবার আর কুটুমরে বাকিতে পার করবো না।

নসুর কৌতুকে রোশনী যেন সহজ হয়ে গেল, এই খালি গায়ের কালো মাঝিটি যেন কত পরিচিত। সে বলল, বাণিজ্য তো তোমার দয়ায় হইলো মাঝি, তোমার কাছে আমরা আজীবনের করজদার।'

‘তা কইলে হইবো না কুটুম, দেনা শোধ করতে হইবো। ‘আইচ্ছা, তুমি কোনোদিন ডুলা বেইছো, আমি কিনমু।'

হো হো করে হেসে উঠলো মাঝি, রোশনীও হাসলো, কতদিন পরে হাসলো সে হিসেব ভুলে গেছে সে। মজিদ কিছু না বুঝেই হাসছে। রোশনী ডিঙ্গিতে বসে নসুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার তো ক্ষতি কইরা দিলাম মাঝি, মুরুব্বী তো তোমার উপ্রে রাগ করছে।

‘আরে ধুর, ঐসব নসু মাঝি পাত্তা দেয় না। কত বিচার বসাইছে, সালিশ ডাকছে, আমার কচুও হয় নাই। দরমাইন্নারাও এই নসুরে ডরায়।

‘ক্যান ডরায়? আমার তো তোমারে ডর লাগে না।

‘আমি একলা মানুষ, আগে পিছে কেউ নাই। আমার লাইগা কান্দনের কেউ নাই, আমার ডরও নাই, যার ডর নাই তারে সবাই ডরায়। কিছুক্ষন থেমে বৈঠা চালিয়ে শান্ত পানিকে দ্বিখণ্ডিত করে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কুটুম মানুষ, গঞ্জে ক্যান? তোমার সুয়ামী কই?

রোশনীর বুকে রক্ত ছলাত করে উঠলো, চোখ দিয়ে ছল ছল করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নসু অবাক হয়ে গেল, মজিদ বলে উঠলো, আমার মামা মইরা গেছে।' |

নসু মাঝি পরম মমতায় বিধবা কুটুমের কান্না দেখছিল, তার মনটা ছটফট করে উঠলো, কিন্তু সে স্থির হয়ে রইলো শান্ত কালী গাঙের মতো।

উঠানে শুকনো পাতা গড়াগড়ি করছে, ঝাঁট দেয়নি আমেনা। আজ দুইদিন হলো চুলা ধরানোর প্রয়োজন হয়নি, তাই রসুই ঘরেও কাজ ছিল তার। দাওয়ায় বসে সে মাঠের সরু পথটার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে অনেক চিন্তা আসছে অধিকাংশই ভালো চিন্তা নয়। মজিদ ছাড়া তার আর কিছু নেই, তার স্বামী মজিদের গায়ে হাত দিয়ে কসম কেটে তবুও চুরি করেছে। সেই কসমের কু প্রভাবে মজিদের একটা ক্ষতি হতেই পারে। মাঠের মধ্যে দূরে দুটি বিন্দু দেখতে পেলো আমেনা, ক্ষুদ্র বিন্দুটি চোখে পড়তেই বুক থেকে যেন কয়েক মন ভার নেমে গেল। মজিদ এখনো মুড়ি বাতাসা চাবাচ্ছে। রোশনীর হাতের পুটলীতে সের দুয়েক চাল নিয়ে এসেছে, মজিদ এক মুঠো মুড়ি আর কিছু বাতাসা তার মায়ের দিকে এগিয়ে দিলো, “মা তোর লাইগা আনছি।'

আমেনা ছেলেকে বুকের মধ্যে পুরে নিলো। দৃশ্যটা পূর্ণ হতো যদি আমেনার চোখ বেয়ে জল নেমে আসতো কিন্তু সে সাধ্য তো তার নেই।

৮

রাত্রিবেলা হঠাৎ করে মেঘ গর্জনের মত একটা ভয়াবহ শব্দ হলো। পুরো জেলখানা কেঁপে উঠলো, তারপরেই একটা বিকট চিৎকার, সেই সাথে কোরাসে আবার সেই শব্দ এবং আবার কয়েকটা চিৎকার। তারপর ঢংঢং করে ঘণ্টা বাজলো, ইউসুফ মুন্সি চোখ বড়ো বড়ো করে উৎকণ্ঠায় বলে উঠলো, ‘পাগলা ঘণ্টা।

সেই ঘণ্টায় মধ্যরাত্রে জেলখানার দেয়ালের ইটগুলোও যেন জেগে উঠলো। আলো জ্বলে রাত্রির গভীরতাকে কমিয়ে দিলো। বন্দুকওয়ালা গার্ডরা সবাইকে লাইন করে বের করে আনলো মাঠে। মাঠের মধ্যখানে, একসাথে সাতটা দেহ পড়ে আছে। তাদের গায়ে কালচে রক্ত, দূর থেকে দেখেই বলে দেয়া যায়, দেহগুলোতে প্রাণ নেই। দুই একটা লাশের চেহারা দেখা যায়, ফজর আলী তাদের চিনে, কতবার দেখা হয়েছে, সকালে লাইনে দাঁড়িয়ে অথবা কচু ক্ষেতে। ভীত গলায় সে ইউসুফ মুন্সিকে জিজ্ঞাসা করলো, “কী হয়েছে?

ইউসুফ মুন্সি কিছু বলতে পারলো না, তার পেছনে থাকা সুজন মাস্টার বলল, ‘পলাইতে চাইছিল।'

জেলারসাহেব এসেছেন। তার চোখ মুখ বেশ উৎফুল্ল, ঘুম ভাঙার বিরক্তি নেই, সম্ভবত তিনি ঘুমান নাই, সামনে এসে বললেন, ‘এরা জেল পালানোর প্ল্যান করছিল, আমি জানতাম। এরা চাবি বানিয়েছে, আমি দেখেছি। কিন্তু কিছু বলিনি। আমি চেয়েছি তারা পালাক, আমি এদের মুক্তি দিতে চেয়েছি। আজ তারা মুক্ত। এদের প্রত্যেকের শরীরে তেরোটা করে বুলেট আছে, এতো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি কৃপণ নই। এখানে যারা আছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি আমার জেলখানা থেকে পালাতে চাও, আমি বাধা দিবো না। কিন্তু ধরা খেও না, আমি ধরতে পারলে, আবার এই জেলখানায় ফিরিয়ে আনবো, তখন তোমার বুকেও তেরোটা বুলেট থাকবে, একটাও কম না। আর একটা কথাও বললেন না, হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন। এরকম ঘটনার পর, কয়েদিদের উলোট পালট করা হয়। ইউসুফ মুন্সির সুনামের কারণে তাদের সেলে তেমন পরিবর্তন হলো না, সেখানে শুধু নতুন একজন যুক্ত হলো, পাগলা প্রফেসর।

পাগলা প্রফেসরের আগমনে ইউসুফ মুন্সি নারাজ, সেই সুবাদে ফজরও নারাজ। তারা নিজেরা একসাথে খায়, একসাথে কাজ করে, এক কম্বলে দুইজন শোয় কিন্তু প্রফেসর তাদের থেকে আলাদা, একা একা থাকেন, কীসব বইপত্র পড়েন, আর একটা কম্বলে তিনি একাই থাকেন। ইউসুফ মুন্সি যখন নামাজ পড়ায়, প্রফেসর ছাড়া সবাই কাতার করে দাঁড়িয়ে যায়। বেনামাজী প্রফেসরের উপর ইউসুফ মুন্সির ক্ষোভটা তাতে আরো বেড়ে যায়।

বাচ্চু মিয়ার বোন দেখা করতে এসেছিল তার সাথে, খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো চিড়ার মোয়া দিয়ে গেছে। সেলে আসতেই সবাই ঘিরে ধরলো, সে সবাইকে একটা করে মোয়া দিলো, শুধু প্রফেসর বাদে। ইউসুফ মুন্সি বেশ শব্দ করে মোয়া খাচ্ছে, স্বাভাবিকের চেয়ে গলা উঁচু করে বলল, "খুব সোয়াদ হইছে রে বাচ্চু। বহুতদিন বাদে এমন কিছু খাইলাম।'

যাকে উদ্দেশ্য করে গলা উঁচু করে বলা সেইজন যেন এই দুনিয়ায় নাই, সে কী একটা মোটা বইয়ের দিকে ঘণ্টাখানেক হলো তাকিয়ে আছে। ফজর বুঝলো, কেন যেন মায়া হলো এই পাগলা প্রফেসরের জন্য। হাতের মোয়াটি আর খেতে পারলো না সে, পকেটে পুরে রেখে দিলো।

গভীর রাতে ফজর কম্বল সরিয়ে উঠলো, সবাই ঘুমাচ্ছে, সুজন মাস্টার প্রবল বেগে নাক ডাকছে। শুধু একটি মানুষ জেগে আছে, প্রফেসর। বাহিরের ল্যাম্প পোস্টের খানিকটা আলো ঢুকছে এই সেলে, সেই আলোতেই বই খুলে বসেছেন তিনি। ফজর ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে অর্ধেকটা মোয়া বের করে প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে দিলো। প্রফেসর অবাক হলো, কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। আবার চোখ নামালেন বইয়ের দিকে। ফজর মোয়াটা ধরে রেখেই বলল, খুব সোয়াদ, আপনে আসতে চাবাইয়া খাইয়া ফেলেন, কেউ দেখবো না, কাউরে কওন লাগবো না।'

প্রফেসর বিরক্তি সহকারে তাকালেন। তারপর বললেন, যাও ঘুমাও গিয়ে, আমাকে ডিস্টার্ব করো না।

এই প্রথম প্রফেসরের মুখে কথা শুনলো ফজর, শুদ্ধ কথা শুনে অভ্যাস নেই ফজরের, তাই কিছু বুঝতে পারলো না। ফজর ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়িয়েই রাখলো। প্রফেসর এবার চোখ পাকিয়ে একটু ধমকের সুরে বললেন, আমাকে একা থাকতে দাও, বুঝে না কি বলি?

ফজর মুখের ভাষা কতটুকু বুঝেছে কে জানে, কিন্তু চোখের ভাষা ঠিক বুঝতে পারলো, অপরাধীর মতো চোখ নামিয়ে মোয়াটা পকেটে ভরে রাখলো। প্রফেসরের মনে হলো, এতো কঠিনভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি, এই প্রথম জেলে কেউ তাকে কিছু সেধেছে। শুতে যাচ্ছিলো ফজর, প্রফেসর তাকে ডেকে বললেন, 'দাও দেখি কেমন খেতে চিড়ার মোয়া।

ফজর হাসিমুখে মোয়া বের করে দিয়ে বলল, 'হাদলে ছাগল খায় না, ভোতার লাগল পায় না।' বলেই সে বুঝলো, ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। প্রফেসর ভ্রু কুচকে তাকালেন, ফজর সাথে সাথে বলল, ভুলে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে।

প্রফেসর হেসে ফেললেন, ফজর আলীর মনের সব ভয় যেন কেটে গেল। প্রফেসর একটু খেয়ে বাকিটা আবার ফজর আলীর হাতে তুলে দিলেন। ফজর আলী মুহূর্ত দেরি না করে কামড় বসিয়ে দিলো। প্রফেসরকে সে শব্দ করে চাবাতে মানা করেছে, কিন্তু সে নিজেই বেশ শব্দ করে মোয়া খাচ্ছে। প্রফেসর কিছুক্ষণ মোয়া খাওয়া দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী?

'ফজর আলী। 'এখানে কেন? চুরি করেছো?'

'না চুরি না কইরাই আইছি, তয় আগে চুরি করতাম। আইচ্ছা আপনেরে সবাই পাগলা পফেসর কয় ক্যান?

'পৃথিবীর সবাই কারো না কারো কাছে পাগল। আইনস্টাইন, নিউটনকেও কিছু লোক পাগল ভাবতো। তুমি মধ্যরাতে জোর করে আমাকে মোয়া খাইয়েছো এটা আমার কাছে পাগলামী, কিন্তু তোমার কাছে স্বাভাবিক। আমরা যার কথা, আচরণ বুঝতে পারি না, তাকেই পাগল বলি। আমার কথা বুঝেছো?'

'জে না।

'তাহলে আমি তোমার কাছে পাগলই রইলাম।'

'আপনেরে এমনে দেখলে পাগল মনে অয় না, খালি বাইরে গিয়া যহন সুরা পড়েন তহন পাগল পাগল লাগে।

ওটা সুরা নয়, কবিতা পড়ি।'

'কবিতা পইড়া কী হইবো, সোয়াব পাইবেন?

সে তুমি বুঝবে না, ফজর।

'আপনের নাম কী?

'আমার এখন নাম নেই, নম্বর আছে; নাম মুছে দিয়েছি অনেক আগে।

'আপনে কী কইরা আইছেন?

'খুন করেছি, খুন। '

আপনারে দেইখা মনে হয় না আপনে খুন করছেন।

'তুমি খুব সরল মানুষ ফজর। সরল মানুষের চিন্তা হয় সরল এবং বিশুদ্ধ।।

'কারে খুন করছেন?

প্রফেসরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। রাত্রীর গভীর কালো ভর করলো তার মুখে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যাও ঘুমাতে যাও।'

জগতে কত ধরনের ঘটনা ঘটে যায়। জেলখানার সেই ছোট্ট সেলেও যেন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিত সিঁধেল চোরের সাথে সখ্যতা হয়ে গেছে বিদেশ থেকে পিএইচডি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের। তাদের পৃথিবী ভিন্ন, তাদের ভাষা ভিন্ন তবুও প্রকৃতি তাদের এক জায়গায় এনে জড়ো করলো। তাদের সবকিছু বিপরীত হলেও মিল আছে, সবার কাছের মানুষজন তাদের সাথে দেখা করতে আসে, কিন্তু এই দুজনের কেউ আসে না। একা একা যখন দুজন বসে থাকে তখন প্রফেসর ফজর আলীকে সান্ত্বনা দেন। মাঝেমধ্যে কবিতা শুনিয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করেন। কবিতা শুনে ফজর আলীর মনে সন্দেহটা আরো প্রবল হয়, এই লোক নিশ্চিত পাগল। একদিন বলেই বসলো, এই হাবিজাবি কেডা লেখছে।

'জীবনানন্দ দাশ।'

‘পাগল আছিল মনে হয়।

‘হা হা হা! তা হয়তো ছিল একটু, চাঁপা খুব ভালোবাসতো জীবনানন্দের কবিতা। জোছনা রাতে বাগানে বসে আমি কবিতা পড়তাম, সে শুনতে।

‘চাপা কে?

প্রফেসরের বুকটা ধক করে উঠলো, আনমনে বললেন, ‘চাপা আমার বউ।'

‘উনি কই? আপনের লগে দেখা করতে আসে না?

প্রফেসরের গলাটা ধরে এলো, বুকটা ভেতরে কে যেন মুচড়ে দিচ্ছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সে আর আসবে না রে, আর কখনো আসবে না।

‘ক্যান?'

প্রফেসরের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, শীতের উঠানের মতো। চোখদুটিতে শুকিয়ে যাওয়া কুয়ার শূন্যতা। হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিয়ে বললেন, ‘কারণ, আমি তাকে খুন করেছি।'

৯

মুক্ত পৃথিবীতে আরো দুটি প্রাণির মধ্যে সখ্যতা হয়ে গেছে। একজন সদ্য বিধবা আরেকজন স্বজনহীন মাঝি। তাদের বুক ভরা মমতা, চোখ ভরা আকুতি কিন্তু মুখে কোনো ভাষা নেই। রোশনীর জট পাকিয়ে যাওয়া পাটের আঁশের মতো চুলগুলো সেই সখ্যতার জোরে তেলের ছোয়া পাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে দাগ হয়ে যাওয়া গালে চার আনায় কেনা সুগন্ধি পাউডারের ছোয়া লাগছে। চুলে বাধার জন্য ফিতা কিনে দিয়েছে। নসু মাঝি, রোশনী ভান করে নিতে চায়নি। নসু জোর করে ধরিয়ে দিয়েছে, অবশ্য জোর না করলেও চলতো। বিধবা নারী সেই ফিতা চুলে লাগিয়ে সাজতে পারে না, কিন্তু গভীর রাতে আমেনা ঘুমিয়ে গেলে, ফিতাগুলো চুলে বাঁধে, পুকুরের শান্ত জলে গিয়ে নিজেকে দেখতে চায়, অন্ধকার রাত্রিতে শুধু তার ছায়া দেখা যায়। আজকাল অকারণেই হাসে সে, কারণ ছাড়াই কাঁদে। সেদিন নৌকায় উঠার সময় নসু, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। রোশনী ধরতে পারেনি, ভেতর থেকে কে যেন বাধা দিচ্ছিলো। নৌকায় বসে কাঁদছিল রোশনী। নসু মাঝি কষ্ট পেলো, রোশনীকে কষ্ট দিয়েছে বলে। হাত বাড়ানো তার স্পর্ধা হয়েছে, মনে মনে নিজেকে গালি দিলো নসু। রোশনী মাথা তুলে নসুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার হাত ধইরো না মাঝি, আমি অভাগী। তোমার সর্বনাশ হইবো।'

'আমার সর্বনাশের আর কিছু বাকি নাই, সব সর্বনাশ আগেই হইছে।

ঠিক তখনি নদীর পার ঘেসে খুব করুণ এক দৃশ্যের অবতারনা ঘটলো। খালি গায়ে লুঙ্গি পরা একটি লোক কলাপাতায় মুড়িয়ে একটি ছোটো লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পেছনে একটি মেয়ে, তার কোলে আরেকটি লাশ। মেয়েটি লাশের ভার বহন করতে পারছে না, মাঝেমধ্যেই থেমে শ্বাস টানছে। মাঝি লাফ দিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেল। মজিদকে নৌকায় বসিয়ে রোশনীও নেমে গেল। মেয়েটির হাত থেকে ছোটো লাশটি নিতে চাইলো নসু। মেয়েটি আঁতকে উঠে বলল, 'ধইরো না, কলেরার মরা।'

মাঝি একটু থমকে গেল, তারপর একরকম জোর করেই লাশটি কোলে নিলো। দুই বছরের বাচ্চা, গায়ে কাফনের কাপড় জোটেনি, মায়ের পুরনো শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা

হয়েছে। সামনের লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। দুই ছেলে এক বিছানায় মারা গেছে তার, কেউ এগিয়ে আসেনি, কলেরার মরা ছুঁয়ে মরবে নাকি? স্বামী-স্ত্রী মিলে কবর দিতে যাচ্ছিলো তাদের মানিকগুলোকে। মৃত্যুভয়হীন দুটি মানুষ অবাক করে দিয়ে তাদের সঙ্গী হলো। মেয়েটি লাশটি নসু মাঝির কোলে দিয়ে কোলছাড়া হলো, এতক্ষণে সে শোক করার অবসর পেলো। রোশনীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে চলল, তার কোলের সন্তানগুলোকে মাটি চাপা দিতে।

ফেরার সময় নসু একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ পরেও তার ভেজা চোখ শুকায়নি। রোশনী নীরবতা ভঙ্গ করলো, তোমার বাপমার কতা মনে হইছে?

‘কলেরায় মরছে গো কুটুম, সবাইরে লইয়া গেছে কলেরায়, আমারে রাইখ্যা গেছে। যেই কলেরারে সবাই ডরায়, আমি হেই কলেরারে ডরাই না। আমি এহন কোনো কিছুরে ডরাই না।'

বুকটা হু হু করে উঠলো রোশনীর। নৌকার কাছে এসে নসু লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, রোশনী হাত বাড়িয়ে দিলো। নসু নিজের হৃদকম্পন নিয়ন্ত্রণ করে বলল, না গো কুটুম, আমি মরা ধইরা আসছি।'

‘আমিও তো মরাই মাঝি।

‘তোমার কলেরা হইবো, ডরাও না?'

‘আমিও আর কিছুরে ডরাই না মাঝি।

***

রোশনীর গঞ্জে যাওয়া নিয়ে মাতব্বর শ্রেণি নাখোশ ছিলেন, তবে পুকুরঘাটের নারী সমাজ খুব উদ্বেলিত হলো। তাদের গল্পের অভাব হয় না এখন। রোশনীর সাথে সাথে আমেনাকে জড়িয়ে কতরকম ডালপালা যুক্ত গল্প যে তারা রচনা করতো। নসু মাঝি আর রোশনীর নাম ঘৃণাভরে অথচ উচ্ছ্বাসের সাথে উচ্চারিত হতো পুকুরঘাটে। মুখরা হুরমতি সারাদিন গলার রগ ফুলিয়ে তালপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে আমেনাকে এসব গল্পগুজব গালি সহযোগে জানাতে কোনোরকম আলস্য করতো না। আমেনা বরাবরের মতোই নীরবে

শুনে যেতো। আজ যেন হুরমতির গলাটা একটু প্রসন্ন, ভোরবেলা আমেনার রসুই ঘরের ধোয়া দেখেই বলল, ‘খাইয়া ল মাগী, খাইয়া ল, আর বেশিদিন নাই, মাতব্বররা সালিশ বসাইবা, গঞ্জে গিয়া বেশ্যাগিরী ছুটাইবোর মোল্লা বাড়ি থেইক্যা বেশ্যাগো বিদায় করবো মাতব্বরেরা। তহন যাইস দুই মাগী নসু ভাতারের লগে।

আমেনার মুখটা পাংশু বর্ণ হয়ে গেল। সালিশ বসলে যে তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, সেটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। এই গ্রামে স্বামীহীনাদের কোনো আশ্রয় নেই। সারাদিন মনের ভেতর শিকারি বাঘের মতো চিন্তাটা তাকে হানা করলো।

মনের বাঘটি রাতেও তাকে ঘুমাতে দিচ্ছিলো না, অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। রোশনী বলে উঠলো, “কী গো ঘুমাও নাই?

‘না গো ভাবী ঘুম আসে না। তুমি ঘুমাও না ক্যান? ‘একটা খবর শুনছি, খারাপ খবর।

আমেনার মনে চিন্তাগুলো ঝড় তুলে ফেলল মুহূর্তে, রোশনীও কী জেনে গেছে সালিশের খবর? আমেনা বুকের ঝড়টা মুখে না এনে নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করলো, কী খবর?

‘দেশে নাকি যুদ্ধ হইবো।'

আমেনা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, সালিশের চেয়ে যুদ্ধ ভালো। সে বলল, ‘যুদ্ধ হইলে হোক, আমগো কী?

আমেনা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, রোশনী ঘুমাতে পারলো না, তার মনে হচ্ছে কোনো একটা ভয়ংকর বিপদ আসছে।

মানুষগুলো কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। উত্তরের ক্ষেত থেকে ডাক দিলে যার গলার আওয়াজ দক্ষিণের ক্ষেতে পাওয়া যেতো, সেই লোকও এখন ফিসফিস করে কথা বলে। গ্রামের মাতব্বরেরা গ্রামের ডাঙ্গর মেয়েদেরে ত্রুটি খুঁজতে কিংবা ছোকরা ছেলের বেয়াদবীর শাস্তি দিতে বের হয় না। ভয়ে সংকোচে ফ্যাকাসে হয়ে ঘরে বসে হুকো টানে। রোশনীর মাছ ধরার চাই, ডুলা, চাটাই পড়ে থাকে, কেউ কিনতে আসে না। রোশনী গঞ্জে অনেক অপরিচিত মানুষ ঘুরতে দেখে, শহর থেকে এসেছে তারা, সবার মুখে দিশেহারা ভাব। লোকগুলোর চেহারা দেখলেই ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ঢাকায় নাকি গুলি চলেছে,

অনেক মানুষ মরে রাস্তায় পড়ে আছে। গুলির কথা শুনে অনেকদিন বাদে বাবুল মিয়ার কথা মনে পড়ল রোশনীর। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো তার।

১০

মোটা উঁচু দেয়াল ভেদ করে মুক্ত পৃথিবীর অনেক খবরই পৌঁছায় না জেলখানায়। দেয়ালের ঐ পাশের খবরগুলো তাদের অজানাই থেকে যায়। কিন্তু যুদ্ধের খবরটা ঠিক পৌছে গেল জেলখানায়। ভেতরের পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যাওয়াতেই বুঝি ব্যাপারটা সবাই আন্দাজ করে নিলো। বাঙালি গার্ডের জায়গায় দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দি পরা বিশালদেহী সৈনিক। আগের মতো নিয়মিত গণনা করা হয় না। তাদের খাবারের প্লেট আগের মতো পূর্ণ হয় না, অর্ধেক খালি থেকে যায়। তিনবেলা নিয়মিত খাবারও জুটে না, হিন্দু কয়েদীদের আলাদা করে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলছে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। সুজন মাস্টার ছিল জেলখানার রেডিও, তার কাছে সব খবর পাওয়া যেতো। একদিন এসে বলল, ‘ঢাকায় গোলাগুলি হইছে, বহুত মানুষ মরছে। এইবার বাঙালিরা আর সইহ্য করতো না, দেখাইয়া দিবো।

ইউসুফ মুন্সি শ্লেষমাখা কণ্ঠে বলল, কইথিকা পাও এইসব খবর? মানুষ মরে নাই, হিন্দু মরছে, ইন্ডিয়ার দালাল মরছে। এই মুসলমানগো দেশ, মুসলমানরা মুসলমানগো লগে যুদ্ধ করতো না। আমাগো যুদ্ধ একটাই ইসলাম রক্ষার যুদ্ধ।

সুজন গ্রাহ্য না করে আবার বলল, ‘শেখসাহেবরে ধইরা নিয়া গেছে পশ্চিমে।

বাচ্চু উৎফুল্ল হয়ে বলল, ‘ইয়ে আচ্ছা কাম হুয়া, বাঙালি ফকিন্নীর বাচ্চাগো খালি উসকাতা হায় ও। ‘বাঙালি ফকিন্নীর বাচ্চা' কথাটা শুনে নবাব পুত্র পাকিস্তানি বাচ্চুর দিকে সবাই সরু নজরে তাকালো, এমনকি ইউসুফ মুন্সিও।

***

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় ঢাকার আগুন মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়েছে। মফস্বলের এই জেলখানাতেও তার ছোঁয়া লেগেছে। এখন আর কারো সাথে দেখা করতে স্বজনেরা আসে না। জেলের নতুন হাজতিরা যেই ঘরে থাকতো, সেটাকে বলা হতো আমদানী ঘর। আমদানী ঘর ততদিনে রপ্তানী ঘর হয়ে গেছে। ভেতরে তাকালে দেখা যেতো ভীত সন্ত্রস্ত

একদল মানুষ, অধিকাংশ নগ্ন, তাদের দেহ রক্তাক্ত, তাদের কারো হাতে নখ নেই, সব নখ উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রতিদিনই সেখানে গুলির শব্দ পাওয়া যেতো, সেই ঘর থেকে কাউকে জীবন্ত বের হতে দেখেনি কেউ।

মাঝেমধ্যেই সকালে লাইন ধরে গোনার সময়, মোটা গোফওয়ালা গার্ডটি কিছু লোককে লাইন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতো, তারাও আর ফিরে আসতো না। কানাঘুষা চলতো, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করতো না। গুঞ্জন উঠতো, সেই লোকগুলো নাকি মুক্তি ফৌজের পক্ষের লোক। তারা জেলখানায় বসে অন্য কয়েদীদের ইন্ডিয়ার দালাল বানাচ্ছিল।

সকাল বেলার গণনা হচ্ছে। পাঞ্জাবী অফিসার আজ নিজে কয়েদীদের দেখছেন। এই সময়টায় সবাই ভয়ে ভয়ে থাকতো, কোনো কারণে কারো ডাক পড়লেই শেষ। লাইনের সামনে হেঁটে হেঁটে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই অফিসার প্রত্যেকের দিকে তাকাচ্ছে। তার জুতার মচ মচ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ হচ্ছে না। কেউ জোরে নিঃশ্বাসও ছাড়তে পারছে না, নিঃশ্বাস ছাড়লেই যেন সেটা নীরবতা ভঙ্গ করবে। পাঞ্জাবী অফিসার সুজনকে আঙুলের ইশারায় ডাকলো, তারপর সে আঙুল তুলল ফজর আলীর দিকে। ফজর আলীর মাথা ভন ভন করে ঘুরতে থাকলো, বুকটা ভেঙ্গেচুড়ে গেল। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, যেন পৃথিবীর সব বাতাস ফুরিয়ে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মজিদের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলো, আশ্চর্য ব্যাপার হলো, সে মজিদের চেহারাটা মনে করতে পারলো না।

আমদানী ঘরের পেছনে তাদের দাঁড় করানো হলো, জায়গাটা ঝোপঝাড় দখল করে রেখেছে। ফজর দাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। একবার চিন্তা করলো, মাফ চাইবে, কিন্তু অপরাধ কী সেটাই জানে না, কীসের জন্য মাফ চাইবে? মাফ চেয়েও কি লাভ হবে? গুলির অপেক্ষা করতে লাগলো ফজর, হঠাৎ এক পাঞ্জাবীর গলা শোনা গেল, ‘খোদো!

ফজর চোখ খুলে দেখলো, তাদের সামনে কোদাল। গর্ত করতে বলছে।

***

সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। ইউসুফ মুন্সি নফল নামাজে বসে গেছে। সে সুজন আর ফজর আলীর জন্য দোয়া করছে। যতবার হাত তুলছে ততবার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে তার দাড়িগুলো ভিজে যাচ্ছিল। ফজর আলীকে আসলেই সে খুব ভালোবাসতো। বাচ্চু নির্বিকারভাবে বসে আছে, সে মনেপ্রাণে পাকিস্তানি হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত, পাকিস্তানিদের কাছে মৃত্যু ডালভাত ব্যাপার। প্রফেসর বইয়ে মুখ গুঁজে বসে আছে, মুখ বইয়ে থাকলেও তিনি বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

সেলের লোহার দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, সুজন আর ফজর ঢুকলো। ইউসুফ মুন্সি 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর' বলে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। দুই হাতে ফজরকে জড়িয়ে ধরলো, তার দাড়ি বেয়ে এখনো পানি ঝরছে। ফজর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, সুজন ধপ করে বসে পড়ল। প্রফেসরসাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করে আবার বইয়ে মুখ খুঁজলেন। বাচ্চু নাকের পশম টেনে ছিড়ছিল, সে তার কাজ অব্যাহত রেখে জিজ্ঞাসা করলো, 'ছোড় দিয়া কিউ? কিল ঘুষি খায়?"

সুজন কিছু বলল না, ফজর বিড়বিড় করে বলল, 'লাশ চাপা দিছি, অনেক, অনেক লাশ।

***

নিত্যদিন ফজর আলীকে নতুন নতুন কবর খুঁড়তে হতো। লাশগুলোর হাতে একজন ধরতো আর পায়ে একজন, তারপর গর্তে ছুড়ে মারতো। হাতপা মুচড়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকতো লাশগুলো। একটা গর্তে কয়েকটা লাশ। সুজন আমদানী ঘর থেকে ঝাড়ু দিয়ে নখ অথবা কাটা আঙুল জড়ো করতো, লাশগুলো ফেলার পর কোনো কোনোদিন এক ঝুড়ি নখ জমে যেতো। সেই নখগুলোও গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয় তারা। সুজন মাস্টার মাঝেমধ্যে রাতে চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে যায়। ফজরও কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে। এখন লাশগুলোকে শুধু লাশ মনে হয় তার। এই সব শরীরে এক কালে প্রাণ ছিল, নখবিহীন এসব আঙুল প্রেমিকার গাল ছুয়েছে অথবা সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়েছে তা একবারও মাথায় আসে না ফজরের।

আমদানি ঘরের পাশে বসে বিড়ি টানছিল ফজর। হঠাৎ মাথার উপরে জানালা দিয়ে কেউ একজন ডাকলো। কাতর গলায় বলল, “বিড়ি আছে?

ফজর মুখ তুলে চাইলো জানালায়, একটা পরিচিত মুখ, দেখে খুশি হবে নাকি কষ্ট পাবে বুঝতে পারছে না সে। এই সেই নাদির গুন্ডা। সে উচ্ছাসে বলল, “ভাই আমারে চিনতে পারেন নাই? আমি আপনের সাথে হাজতে আছিলাম কিছুক্ষণ, আপনে আমারে এক প্যাকেট সিকেরেট দিছিলেন।'

নাদির গুন্ডা চিনতে পারলো। তার মুখেও উচ্ছ্বাস। সে বলল, ‘তোর সাজা হইছে? কয় বছর?

ফজর একটা নতুন বিড়ি ধরিয়ে নাদিরের হাতে দিয়ে বলল, “সাড়ে পাঁচ বছর দিসে। আপনে এইহানে ক্যান?

‘পাঞ্জাবী মারছি, কত্তবড়ো সাহস আমার এলাকার মানুষ মারতে আইছে। গ্যাদা গুন্ডা ধরাইয়া না দিলে আরো দশ বারোডা মারতে পারতাম। জেলখানায় আছস ভালা আছস, এই পাকিস্তানি শুয়োরগুলা মানুষ না, যেমনে পারতাছে মানুষ মারতাছে, জোয়ান মাইয়াগো ধইরা নিয়া নষ্ট করতাছে, বাচ্চাপোলাপান ও ছাড়তাছে না। জানোয়ারের দল। আমারে ঢাকার থেইকা ধইরা এইখানে আনছে, আইজকাইলের মধ্যেই মাইরা ফেলবো, যত তাড়াতাড়ি মারে তত ভালা।'

একটু থেমে আবার বলল, একটু পানি খাওয়াইতে পারবি?

ফজর আলী দৌড়ে বের হয়ে গেল পানির সন্ধানে। একটা টিনের মগে পানি ভর্তি করে এসে দেখলো জানালাটা ফাকা। তারপর আর কোনোদিন সে নাদির গুন্ডাকে দেখেনি।

অন্ধকার ফজর আলীকে ঘুম পাড়াতে পারছে না। মেঝেতে উপুর হয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে আছে সে, তার বুক ফেটে কান্না আসছে। প্রফেসর ফজরের পিঠে হাত রাখলো, জিজ্ঞাসা করলো, “কী হয়েছে ফজর?

ফজর কুর্তার আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে বলল, “স্যার, আমি এইখানে থাকলে মইরা যামু।'

'এখানের খাওয়াদাওয়া পরিশ্রম সব একসময় তোমার শরীর মানিয়ে নেবে।

'না স্যার, খাওনের কষ্ট সইহ্য করতে পারুম, আমগো জীবনে এর চেয়ে বেশি কষ্ট পাইয়া আইছি।'

'তাহলে কী হয়েছে?

'আমার পোলাডার চেহারা ভুইল্যা গেছি স্যার, মনে করতে পারি। আমি আমার মজিদের চেহারা মনে করতে পারি না।'

'আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। প্রিয়জনদের চেহারা বেশিদিন মনে রাখা যায় না, মন ভুলিয়ে দেয়, যাতে চোখ বার বার তাদের দেখে। সেজন্যই তারা প্রিয়জন।'

'স্যার আমি এইখান থেইক্যা পলাইয়া যামু।

'সবাই আমাকে পাগলে বলে, কিন্তু এখন তুমি পাগলের মতো কথা বলছো। তেরোটা বুলেটের কথা মনে আছে?

'মরণের ভয় নাই, এইখানে পেত্যেকদিন মরি।

'হুট করে কোনো ভুল করো না।

'আপনে বুঝতাছেন না স্যার, আমার পরাণডা কেমন করতাছে।

প্রফেসরের চোখ যেন জ্বলে উঠলো, বলল, আমি বুঝবো না? তুমি আজ না হয় কাল এখান থেকে বেরুবে। তোমার ছেলেকে দেখবে, বউকে দেখবে। আমি এখান থেকে বের হলেও আমার প্রিয়জনদের দেখতে পারবো না। তার চেহারা মনে করার চেষ্টা করি প্রতিদিন কিন্তু পারি না, কোনোদিন পিরবোও না, কারণ তাকে আর কোনোদিন দেখবো না আমি।'

ফজর একটু লজ্জিত হলো, বলল, স্যার আমার মনে হয় আপনে আপনার বউরে খুন করেন নাই।'

'তুমি বড়ো সরল লোক ফজর। আমি তোমাকে সাহায্য করবো পালাতে। তবে আমি যা বলবো সব মানতে হবে। যদি সব মানো তাহলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তুমি এই জেলের বাহিরে থাকবে।

'না স্যার এতো সুমায় নাই, নাদির ভাই কইছে, পাঞ্জাবীরা নাকি মাইয়াগো ধইরা ইজ্জত নষ্ট করতাছে, বাচ্চাগো বন্দুকের ছুড়ি দিয়া খুচাইয়া খুচাইয়া মারে। হাছা মিছা জানি না,

আমারে তাড়াতাড়ি আমার আমেনা আর মজিদের কাছে যাইতে হইবো।'

'ঠিক আছে এখন ঘুমাও, কাল এ ব্যাপারে কথা হবে।'

হঠাৎ বাচ্চু নড়েচড়ে উঠলো, সে চোখ ডলে উঠে বলল, 'হাম ভী যায়েঙ্গে। নেহী তো জেলারকো সব কইয়া দিমু।

***

বাচ্চুর ভাবভঙ্গীতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, সে ফজর আলীর সাথে আঠার মতো লেগে আছে। সে প্রফেসরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না, তাকে ছাড়াও পরিকল্পনা করতে পারে, সে হলে তাই করতো। রাতে শোয়ার সময় সে নিজের জায়গা ছেড়ে ফজরের পাশে এসে শুয়েছে। তার আচরণে ইউসুফ মুন্সি একটু অবাক হলো।

সুজন খবর নিয়ে এসেছে, সে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। একটু দম নিয়ে বলল, 'মুক্তিফৌজ হইছে, পাকিস্তানিগো লগে তারা যুদ্ধ করতাছে, সবাই দলে দলে মুক্তিফৌজে নাম লেখাইতাছে।'

ইউসুফ মুন্সি মাথা দুলিয়ে বলল, কই থেইক্যা ভুয়া খবর লইয়া আসো, সবাই নাম লেখাইতেছে না, হিন্দুরা মুক্তিফৌজ হইছে, লগে আছে ইন্ডিয়ার দালালেরা। দাড়ি কাইটা রাখছে মোছ নাম রাখছে মুক্তিফৌজ।'

সুজন ইউসুফ মুন্সির কথাটা কানে তুলল না, সে বলল, 'গ্রামেগঞ্জে শান্তি কমিটি হইতাছে, রাজাকার বাহিনী হইতাছে, তারা পাঞ্জাবীগো সব চিনায়া দিতাছে।'

ইউসুফ মুন্সি বেশ শব্দ করে উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ, এইটা আসল খবর দিছো। বাঙালিরাও নামতাছে ইসলাম রক্ষার যুদ্ধে, মাশাল্লাহ। ইসশ আমি এহন জেলের বাইরে থাকলে আমিও রাজাকার হইতাম।'

বাচ্চু মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'হাম বাইর হোকারই রাজাকার বানুংগা, এক মাহিনা কা মামলাই তো।'

ইউসুফ মুন্সি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু তোর তো আরো দুই বছরের সাজা বাকি।'

বাচ্চু একটু ভড়কে গেল, ভড়কে গিয়ে আবোলতাবোল কী যেন বলতে বলতে ফজরের পাশে গিয়ে চোখ নামিয়ে বসলো।

দুপুরের খাবারের আগেই ইউসুফ মুন্সি সব জেনে গেল। টিনের বাসনের পোকা আর কঙ্কর ভর্তি ভাত চাবাতে চাবাতে ইউসুফ মুন্সি ফজর আলীকে বলল, তোর কি মাথা নষ্ট হইছে? তুই ঐ পাগলের কতায় নাচস? মরবি কইতাছি।'

ফজর আলী বাচ্চুর দিকে তাকালো, বাচ্চু আবার অপরাধীর ভঙ্গিতে চোখ নামালো। ফজর ইউসুফের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেশে যুদ্ধ লাগছে, বউ পোলার কতা মনে হইলে কইলজাড়া পুড়ায়। প্রফেসর সাবে আওলা মানুষ কিন্তুক হে গিয়ানী লোক, তার কতা হুনলে একটা ব্যবস্তা হইবো।

'যুদ্ধ লাগলে কী হইছে, আমরা মুসলমানের বেটা, আমাগো বউ পোলাগো কিছু হইবো না।'

মুখে এই কথা বললেও ইউসুফ মুন্সি মনে মনে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, পাঞ্জাবীদের নিয়ে তার চিন্তা নাই, তারা পক্ষের লোক। তার চিন্তা হচ্ছে মুক্তিদের নিয়ে, তারা যদি কোনো ক্ষতি করে তার পরিবারের। এমনিতেও অনেকদিন কোনো খবর পাচ্ছে না।

ফজর আলী বলল, 'আমি আর থাকমু না, আমি পলামু। আপনে গেলে আমাগো লগে থাকতে পারেন। কিন্তু আর কাউরে কইয়েন না।'

জেলপালানো নিয়ে সবাই এতো উৎকণ্ঠায় ছিল যে, সুজনকে সারাদিন একবারও দেখা যায়নি, এটা কেউ লক্ষ্য করলো না। সন্ধ্যাবেলা শোয়ার সময় বুঝলো সবাই সুজন নেই। একজন আরেকজনের দিকে কপালে তুলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। বাচ্চু বলল, 'শালে পলাইয়া গ্যায়া।

বাচ্চুকে না বলে পালানোতে সে ক্ষুদ্ধ, মেঝেতে একদলা থুতু ফেলে সে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করলো। ইউসুফ মুন্সি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ফজর অবাক হলো। প্রফেসর

আগের মতোই বইয়ে মুখ গুজে আছে। ফজর প্রফেসরের কাছে গিয়ে বলল, "কী চিন্তা করলেন?

প্রফেসর বই থেকে মুখ বের করে বলল, আমি চিন্তা করেছি কিন্তু কাউকে বলবো না। আমি যা যা বলবো তা করবে শুধু।

ইউসুফ মুন্সি মাথা নাড়িয়ে বলল, এইটা কেমুন কথা?

প্রফেসর বলল, 'কথা এটাই। পরিকল্পনা বলে বেড়ালে, তা সবার কানে ঘুরতে ঘুরতে জেলারের কানে যাবে।'

তারপর বাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, কানে কানে কথা বলার লোক তো আছেই।

বাচ্চু আবার মুখ লুকালো, ইদানিং সে খুব লাজুক হয়ে যাচ্ছে। ইউসুফ মুন্সি একটু চিন্তা করে বলল, 'আইচ্ছা ঠিক আছে, এহন কী করুম, হেইডা কন?'

'অপেক্ষা করো, আর চাইলে ঘুমাতে পারো।'

ইউসুফ মুন্সি আর বাক্যব্যয় করলো না, আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল। ফজর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে বসে সুজনের কথা চিন্তা করছে। বাচ্চু তার একদলা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানে দুটি মাছি ভন ভন করছে।

পরদিন আমদানি ঘরে আবার ডাক পড়ল ফজরের। আমদানি ঘরের বাহিরে একটা লাশ দেখলো ফজর আলী, মুখ থুবড়ে পরে আছে মাটিতে। কাছে যেতে হলো না, দূর থেকে দেখেই সুজনকে চিনে ফেলল ফজর। ফজর এগিয়ে গিয়ে দেখলো, না প্রাণ বাকি আছে, শ্বাস চলছে। ঠোঁট কেটে রক্ত লেগে আছে মুখে। সারা গা ফুলে গেছে। নিঃশ্বাসের গতি খুবই মৃদু। ঠোট ফাক করে একটা শব্দই বলল সুজন, "পানি"। তারপরই মূর্ছা গেল। সৈন্যটি বিরক্ত সহকারে বলল, 'ইসিকো লে যাও, ছালে মুক্তি কো পানি পিলাতা হায়।

পর পর তিন মগ পানি খেয়ে ফেলেছে সুজন। ভাত খেতে পারছে, একবার চেষ্টা করেছিল, হড়বড় করে ভেতর থেকে সব বেরিয়ে গেছে। ইউসুফ মুন্সি সেই বমি পরিষ্কার করেছে। সারারাত বন্দুকের বাট দিয়ে পেটানো হয়েছে তাকে, পানি কিংবা খাওয়াদাওয়া

কিছুই দেয়া হয়নি। এত মার খাওয়ার পর বেঁচে আছে বলেই আর মারেনি। তার অপরাধ আমদানি ঘরে এক আসামীকে পানি খেতে দিয়েছিল।

গায়ে এখন প্রচণ্ড জ্বর সুজনের। কম্বলের নিচে শুয়ে কাঁপছে। জ্বরে প্রলাপ বকছে, কী বলছে বুঝা যাচ্ছে না, শুধু কিছুক্ষণ পর পর চিৎকার করে মাকে ডাকছে। জ্বরের ঘোরে সে ভুলে গেছে, বুক ফাটিয়ে চিৎকার করলেও তার মা আর শুনবে না।

সুজন ঘুমাচ্ছে অথবা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ফজর বারবার সুজনের কপালে হাত দিয়ে দেখছে জ্বর কমছে কিনা। ইউসুফ মুন্সি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, বাচ্চু উশখুশ করছে। প্রফেসর বলল, আমি চিন্তা করে রেখেছি।'

ইউসুফ জিজ্ঞাসা করলো, কী চিন্তা?' 'সেটা তো বলবো না।' 'আমরা কী করতাম?

'কাগজ আর কাঠের টুকরা কুড়াবে। যত পাও তত, আমার কাছে। রাতেরবেলা জমা দেবে।

'কাগজ, কাডের টুকরা দিয়া কী হইবো?'

'সেটা আমি বুঝবো, আর আমাকে প্রতিদিন দুটো করে পাথর কিংবা ইটের টুকরা জোগাড় করে দেবে।'

বাচ্চু বিড়বিড় করে বলল, "ইয়ে আদমি পাগল হ্যায়।

ইউসুফ মুন্সি কিছু বলল না, কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হলো, বাচ্চুর সাথে তার এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

প্রফেসরসাহেব বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে বললেন, 'যদি এখান থেকে বের হতে চাও তবে আমার কথা শুনো, আর যদি মরতে চাও, তবে নিজেরা জেল ভেঙ্গে পালাও।

ফজর ইটের টুকরা খুঁজতে গিয়ে লক্ষ্য করলো, জেলখানায় এই জিনিসটা অতো সহজলভ্য নয়, অথচ সব দেয়ালই ইটের তৈরি। শৌচাগারের গায়ের দেয়ালের কয়েকটা ইট নড়বড়ে। সেদিন ফজর শৌচাগারে গিয়ে বাচ্চুর চেয়েও বেশি সময় নিলো ফজর, বাহিরে রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। একটি ইট পেটের সাথে বেঁধে কুজো হয়ে বের হলো ফজর। তারদিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'তোরে কী কালকে ভাত বেশি দিছেনি?

ফজর কিছু না বলে আড়ালে চলে গেল, গোসলের চৌবাচ্চার পেছনে গিয়ে দেয়ালে ইট ভাঙ্গলো। ঘাস দিয়ে ঢেকে রেখে দুটো টুকরো পকেটে নিয়ে নিলো। প্রফেসরসাহেব, তার পায়চারী শুরু করেছেন, আর বিড়বিড় করছেন। ফজর গিয়ে আড়াল করে তার হাতে দুটো টুকরো তুলে দিলো। প্রফেসরসাহেব এবার স্থান বদলালেন, পূর্ব দিকের দেয়াল ধরে হাঁটছেন তিনি। সবাই যখন গোসলের হুড়াহুড়িতে ব্যস্ত তখন তিনি একটি ইটের টুকরা ছুড়ে মারলেন উপরে। সেটা দেয়ালের ঐ পাশে গিয়ে পড়ল। ফজর কিছুই ভেবে পেলো না, এতো কষ্ট করে সংগ্রহ করা ইটের টুকরা কি বাচ্চাদের মতো ছুড়াছুড়ি খেলার জন্য?

রাতে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে বাচ্চু ঢুকলো, ইউসুফ মুন্সির পকেট ফুলে আছে। বাচ্চু তার পাজামার ভেতর ভরে দুটো চ্যালাকাঠ নিয়ে এসেছে। ঘুমন্ত সুজনের দিকে তাকিয়ে সাবধানে চ্যালাকাঠ দুটো এগিয়ে দিয়েই বলল, ‘রসুই থেইক্যা চুরি করছি।'

কাঠের টুকরা দুটো কম্বলে পেঁচিয়ে রাখা হলো। ইউসুফ মুন্সি পকেট থেকে বেশ কিছু পুরনো কাগজ বের করে দিলো। অধিকাংশই পুরনো খবরের কাগজের টুকরা। প্রফেসর কাগজগুলো ভাজ করতে লাগলেন, প্রত্যেকটা কাগজ তিনি পড়ে দেখছেন। ইউসুফ মুন্সি জিজ্ঞাসা করলো, ‘কাগজ কি পড়ার লাইগা আনাইছেন?

‘এখানের সব বই পড়া শেষ, নতুন কিছু পেলে পড়তে ভালো লাগে।'

ইউসুফ মুন্সি আর কিছু বলতে পারলো না, সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আগে গোপনে ছাড়তো, এখন আর গোপন করতে পারছে না।

ফজর সুজনের পাশে শুয়েছে, সুজনের কপালে হাত রেখেই কখন। ঘুমিয়ে গেছে বলতে পারে না। সুজনের গলা শুনে জেগে উঠলো। সুজন ডাকছে, ‘ফজর ভাই, ও ফজর ভাই।'

‘কী হইছে সুজন? পানির তিয়াস লাগছে?

সুজন ফজরের হাত চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল, আমারে ফালাইয়া যাইও না ভাই, আমিও যামু তোমাগো লগে।

১১

ভোরে এখনো পাখি ডাকে, কিন্তু সেই ডাকে থাকে বিষাদের সুর। সকালের সূর্য গায়ে মেখে হাল কাঁধে নিয়ে দল বেঁধে মাঠে যেতে দেখা যায় না চাষাদের। উঠানে দাদীকে ঘিরে ধরে 'শুক' কিংবা 'কিচ্ছ্যা' বলতে জ্বালায় না বাচ্চাদের দল। তাদের ঘরে পুরে রেখেছে গৃহিণীরা। দুপুরবেলা আর পুকুরঘাটে যায় না মহিলারা, রাতের বেলা যায় কলসি নিয়ে। বুড়ো রইসুদ্দিন গোয়ালঘরের সামনে বসে বিলাপ করে, তার ছেলে উজানে আছে, রাজাকাররা এসে গোয়ালের সব গরু আর সাথে ছেলের বৌকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলের বউয়ের জন্য আক্ষেপ নেই, কিন্তু গরুগুলোর জন্য বুক ফেটে যায় তার।

মিলিটারিরা ক্যাম্প করেছে বলরামপুর গ্রামের পাশের গ্রাম নিশিকান্দিতে। ভয়ে আশেপাশের সব গ্রাম পুরুষ শূন্য হয়ে গেছে। যারা ছিল তারা ঘরে লুকিয়ে থাকে, অথবা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। জোয়ার্দারসাহেব শান্তি কমিটি করেছেন, তার বাড়িতে প্রতিদিন বিরাট মচ্ছব হয়। গরু-খাসি জবাই হচ্ছে প্রতিদিন, মিলিটারির বড়ো অফিসাররা প্রতিদিন দাওয়াত কবুল করে যাচ্ছেন। কলিম ব্যাপারী রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার হয়েছে, তাকে আড়ালে আবডালেও কেউ চোরের দোসর বলার সাহস পায় না এখন।

রোশনী আর গঞ্জে যায় না এখন, কিন্তু সকালে উঠেই সেই বাঁশ নিয়ে বসে থাকে, এটা সেটা বানায়। আমেনা চালের ভাড়ারে চোখ বুলিয়ে শঙ্কিত হয়, মনে মনে শুধু বলে, "কবে শেষ হইবো যুদ্ধ। নসু মাঝি মাঝেমধ্যে লুকিয়ে চলে আসে, এটা সেটা দিয়ে যায়। আমেনা প্রতিবারই নসুকে বলে, এইসবের দরকার নাই, আর কিছু আইনেন না।

কিন্তু কোনোবারই আমেনার গলায় জোর থাকে না। বলরামপুর গ্রাম আর আগের সেই গ্রাম নেই, কিন্তু হুরমতির গলা সেই আগের মতোই আছে। নসু আসলেই সে ব্যঙ্গ করে চেঁচিয়ে বলে, 'ভাতার আইছে? সালুন দিয়া ভাত দেও।

নসু লজ্জায় অপমানে মাটির সাথে মিশে যায়, রোশনী রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে। কিছু বলতে গেলেই আমেনা বাধা দেয় চোখের ইশারায়। হুরমতির স্বামী তরিকত মোল্লা

রাজাকার বাহিনীর সদস্য, তার পাশের বাড়িতে থাকার কারণেই হয়তো এখনো পুরুষবিহীন এই বাড়িতে কারো নজর পড়েনি। কিন্তু কতদিন নজর বাঁচিয়ে থাকা যাবে? নসু আমেনার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভাবি এইখানে আর পইরা থাকার কি দরকার? সবাই চইল্যা যাইতাছে।'

'কই যামু ভাই ঘর ছাইড়া?'

'ঘর তো ঘরের জায়গাত থাকবো, আগে জানডা বাচান। মিলিটাররা নাকি মাইয়ালোকগুলারে ধইরা নিয়া যাইতাছে।'

রোশনী আর আমেনা দুজনেরই বুক কেঁপে উঠে। আমেন বলল, 'বেবাকখানে মিলিটারি আইছে, যামু কই?

নসু মাঝি গলা নামিয়ে বলল, "নালিন্দাবাড়ি থেইক্যা পত্যেকদিন বড়ারে বড়ো নাও যায়, আমি আপনাগো কালী গাঙ দিয়া নালিন্দাবাড়ি নামায়া দিয়া আসুম।'

গলার স্বর আরো নিচু করে নসু বলল, "ঐখানে মুক্তিরা কেম্প করছে। মিলিটারির সাহস নাই হেদিকে যাওনের।

আমেনা শুধু 'হু' বলল। কেন যেনো এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার কথা সে চিন্তা করতে পারে না। একদিন কিছু না ভেবে ভোরে বের হয়ে গিয়েছিল, ভাগ্য তাকে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়ে এনেছে এই ঘরে। কিছু একটা বেঁধে রাখে আমেনাকে, সেটা কী ফজরের স্মৃতি নাকি অপেক্ষা? আমেনা জানে না।

***

দুই সপ্তাহে ইউসুফ মুন্সি আর বাচ্চু মিলে জেলখানার সব কাগজ আর গাছের ডালপালার টুকরা জোগাড় করে ফেলল। জেলখানার ভেতরটা ঝাড়ু দিয়েও এত পরিষ্কার করা যায়নি কোনোদিন, একেবারে তকতক করছে। পরিবেশ দেখে গার্ডরা খুশি, কিন্তু বাচ্চু আর ইউসুফ মুন্সির মুখ মলিন। ইতোমধ্যে তারা নিশ্চিত তারা পাগলের তালে নাচছে, নিজেদের বোকামীর জন্য দিনে শতবার নিজেদের অভিসম্পাত দেয়। সুজন একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু রাতেরবেলা জ্বরটা বেড়ে যায়। তখন সে তার বিস্মৃতপ্রায় মাকে দেখতে

পায়, কথাও বলে। ফজর শুধু দিন গুনছে। তার আর তর সইছে না। পায়চারী করতে থাকা প্রফেসরের কাছে মাঝেমধ্যেই অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কবে?

প্রফেসর ঢিল ছুঁড়ে উপরে, তারপর বলে, ‘সময় হলে।

আজও পূর্বদিকের দেয়াল ঘেষে পায়চারী করছে প্রফেসর। ফজর দুটো ইটের টুকরা নিয়ে তার হাতে দিলো গোপনে। তারপর বলল, ‘হুজুরে কয় আপনে পাগল, আপনের কতায় নাচা ভুল হইছে।

‘তোমারও কি তাই মনে হয়?

ফজর মাথা নিচু করে রাখলো, তারপর বলল, “আর কতদিন এমনে চলবো? কবে যামু এইখান থেইক্যা?’

প্রফেসর কিছু বললেন না, একটুও বিচলিত হলেন না, চারদিকে তাকিয়ে উপরে ঢিল ছুড়লেন। দেয়ালে সাথে লাগানো ল্যাম্পপোস্টের বাতিটি আর্তনাদ করে ভেঙ্গে গেল। তিনি ফজরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আজকেই।

***

ইউসুফ মুন্সি তার পরিবারের কথা বলছে, একটি মেয়ে একটি ছেলে তার। মা-বাবা এখনো বেঁচে আছে। মেয়েটি নাকি তার খুব ন্যাওটা ছিল, এখন সারাদিন কাঁদে। খালি বাজান বাজান’ করে। আঙুলের কড়া গুণে হিসাব করলো ইউসুফ, মেয়ের বয়স তেরো পার হয়ে গেছে, মেয়ের জন্য কী নিয়ে যাবে তাই নিয়ে পরামর্শ চলছে এখন। ফজর এসে বলল, ‘গঞ্জ থেইক্যা শাড়ি কিন্যা লইয়া যাইয়েন, কিন্তুক ট্যাকা কই?

ইউসুফ মুন্সি একটু চিন্তায় পড়ে গেল, তারপর তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বারেকের দোকান থেইক্যা বাকি নিমু, পরে শোধ দিমু।'

শোধের কথা আসতেই ফজর বলল, “দেশে গিয়া কী কাম করবেন?

‘দেশে ইসলামের লাইগ্যা যুদ্ধ হইতাছে, আমিও হেই যুদ্ধে সামিল হমু। রেজাকার হমু।'

বাচ্চু সাথে সাথে সম্মতি দিলো, বলল, “ঠিক বাত, হামভী পাকিস্তানি ভাইগো লগে থাকুঙ্গা।

সুজন ফজরের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কী করবা ফজর ভাই? ফজর শূন্য চোখে তাকিয়ে বলল, জানি না কী করুম।'

ইউসুফ মুন্সি একটা স্নেহের ধমক দিয়ে বলল, জানি না কী আবার? তুই আমার লগে থাকবি, তুইও রেজাকার হবি।'

ইউসুফ মুন্সিকে শ্রদ্ধা করে ফজর। সেও মনে মনে ভাবে, যে যাই বলুক ইউসুফ মুন্সির সাথেই থাকবে সে।

ইউসুফ মুন্সি সুজনের কাছে গিয়ে বলল, "কী সুজন মাস্টর চুপ ক্যান? তুমি কই যাইবা?

সুজন তার চোখ দুটো দেয়ালের দিকে বিছিয়ে বলল, "আমি মুক্তিফৌজে জয়েন দিমু, আমি মুক্তি হমু।

ইউসুফ মুন্সি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করলো না, রাগত কণ্ঠে বলল, "ইন্ডিয়ার দালাল গুলান তোমার মগজধোলাই করছে, ভালা-মন্দ বুঝতাছছা না তুমি। মুসলমানের বেটা হইয়া তুমি ক্যামনে মুক্তি হইতে চাও? পিঠের উপ্রে রাইফেলের বাটের বারি কি ভুইলা গেছো? এই দেশে কোনো মুক্তিগো রেহাই নাই। মরবা, মরবা।'

সুজন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'মরলে মরছি, মরার আগে একটা হইলেও পাঞ্জাবী মাইরা মরমু।'

ইউসুফ মুন্সি শ্লেষোক্তি করলো, "কিলের শইলে কিল বিছারে, কিল পাইলে উথাল পাথাল করে।

***

রাতেরবেলা সবাই গোল হয়ে বসে আছে। চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যে শুধু প্রফেসর স্বভাবমতো বিকারশূন্য। ইউসুফ প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এহন?

প্রফেসর তার বইটি বন্ধ করে একটু ঝুকে বাচ্চুকে বলল, "বিড়ি আছে? বিড়ি ধরাও।

ইউসুফ মুন্সি হতবাক হয়ে বসে রইলো। সে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'এহন কি বিড়ি খাওনের সুমায়? এই তালা ভাইঙ্গা বাইর হমু ক্যামনে? কাগজ-টাগজ কি চাবাইতে আনাইছেন?'

প্রফেসর বলল, 'বিড়ি ধরালেই তালা খুলে যাবে।'

ইউসুফ বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বলল, “কী আজগুবি কতা।

বাচ্চু বিড়ি ধরালো, দুই টান দিয়ে ভুস ভুস করে ধোয়া ছাড়লো। প্রফেসর হাত বাড়িয়ে বিড়ি চাইলো। ফজর খুব বিস্মিত হলো, প্রফেসরকে কখনো বিড়ি খেতে দেখেনি সে। প্রফেসর বিড়িটি হাতে নিয়ে কাগজের স্তুপে ফেলে দিলেন। কাগজের মধ্যে কোথায় যেন বিড়িটি হারিয়ে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লাল আভা জানালো, বিড়ির জীবন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। লাল আভাটা কাগজ ফুড়ে লাল জিহ্বা বের করলো, আগুন জ্বলে উঠলো। শুকনো কাঠ পেয়ে আগুনের মাত্রা বাড়তে লাগলো। বাচ্চু চিৎকার করছে। প্রফেসর সবাইকে এক কোণে টেনে নিয়ে গেল, বলল, ‘যখন গার্ডরা তালা খুলে আগুন নেভাবে, তোমরা শুধু আমাকে অনুসরণ করবে।'

অন্ধকার ঘরটিতে আলোর ঢেউ খেলতে লাগলো। চারদিক থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আলুথালু বেশে সদ্য ঘুম ত্যাগ করে আসা গার্ড হকচকিয়ে গেল আগুন দেখে। আগুনটা প্রায় ফজরদের ছুঁয়ে ফেলছে। গার্ড তাড়াতাড়ি চাবি ঢুকিয়ে গরাদ খুলে ফেলল। হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো পাঁচজন। গার্ড আবার দৌড় দিলো, পাগলা ঘণ্টা বাজাতে অথবা আগুন নেভানোর জন্য সাহায্য আনতে, সে প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। প্রফেসর দৌড়াতে শুরু করলো, তার পেছনে বাকিরা। তারা প্রাণপনে দৌড়ে পূর্ব দেয়াল ঘেষে দাঁড়ালো। অন্যসময় হলে তাদের স্পষ্ট দেখা যেতো কিন্তু এই দেয়ালের পাশের ল্যাম্পটি আজ দুপুরেই চূর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকারের ছায়ায় আশ্রয় নিলো তারা। ফজর হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলো, এহন কী করুম?

প্রফেসর গলা নিচু করে বলল, দেয়ালে ঐপাশে মহিলা ওয়ার্ড, সেখানে কোনো কয়েদী নেই। কিছু সৈন্য থাকে। পাগলা ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে তারা মেইন গেইটের দিকে চলে যাবে। তখন মহিলা ওয়ার্ডের উত্তর দিকের দেয়াল পার করতে হবে, দেয়ালের পাশেই সুপারী গাছ আছে। দেয়ালের ঐ পাশেই জেলজীবনের সমাপ্তি। তবে সেখান থেকে জঙ্গলের পথ ধরে যতক্ষণ পারা যায় দৌড়াতে হবে। যুদ্ধের সময় জেলপালানো কয়েদীদের

খোঁজার জন্য খুব বেশি ঝামেলা করবে না কেউ। এখন ভেতরে আর বাহিরে তেমন পার্থক্য নেই। একটা ছোটো কারাগার, আরেকটা বড়ো কারাগার।'

ইউসুফ মুন্সি ভ্রু নাচিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সবই বুজলাম, তয় এই উচা দেয়াল পার হমু ক্যামনে? এইখানে তো কলাগাছও নাই।

প্রফেসর বলল, 'দেয়াল খুব বেশি উঁচু না, বারো ফিট হবে। একজনের কাঁধে ভর দিয়ে পার হওয়া যাবে।'

ফজর জিজ্ঞাসা করলো, যে শেষে যাইবো হে কার কান্ধে খাড়াইবো?'

প্রফেসর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যে শেষে থাকবে সে যাবে না।'

সুজন আঁতকে উঠলো, সে বলল, "না আমি থাকুম না।'

প্রফেসর হেসে বলল, তোমার চিন্তা নেই, তুমি সবার আগে যাবে। আমিই যাবো না।'

সুজন স্বস্তি পেলো। বাচ্চু, ইউসুফ, আর ফজর হতবাক হয়ে গেল। ইউসুফ মুন্সির মনে এই প্রফেসরের মানসিক অসুস্থতা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। কেউ কিছু বলল না, কেউ চায় না প্রফেসরের সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসুক, শুধু ফজর একটু ব্যথিত হলো।

একদল গার্ড পানি, বালি নিয়ে দৌড়াতে লাগলো, এরমধ্যেই পাগলা ঘণ্টা বিকট শব্দে বেঁজে উঠেছে। শব্দহীন রাত্রীতে শব্দটা দানবের মতো শোনাচ্ছে। একে একে সুজন বাচ্চু ইউসুফ পার হয়ে গেছে, ফজরের কাঁধে পা রেখে। এখন ফজরের পালা। কিন্তু সে নড়তে পারছে না। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্যান স্যার? আপনে যদি না যাইবেন তাইলে এতকিছু ক্যান...?

প্রফেসর কিছু বলতে পারলো না, বলার সাধ্যও নেই। এই জেলখানা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা তার নেই, বাহিরের পৃথিবীতে সে খুনি, আর জেলখানায় সে পাগল। নিজের বউয়ের খুনী হওয়ার চেয়ে পাগল হয়ে থাকা ভালো। আরেকটি যন্ত্রণা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়, একটি সত্য যা সে ভুলতে চায়। যে সত্যকে ঢাকার জন্য সে নিজের বউকে খুন না করেও খুনী হয়েছে। সবাই জানে, তার বাবা ছেলের এই অপরাধ সইতে না পেরে আত্মহত্যা

করেছে। কিন্তু একমাত্র প্রফেসর এবং তার বাবাই জানে কে অপরাধী। প্রফেসর তার বাবাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান মানুষ ভাবতো, সেই বাবাই কিনা বিকৃত রুচির মানুষ। ছেলের বউকে ধর্ষণ করে গলা টিপে মারলো। প্রফেসর তা মানতে পারেনি, এক লহমায় শ্রদ্ধার আসন থেকে বাবাকে খসাতে পারেনি। ছেলে হিসেবে বাবাকে নিয়ে গর্ব করতো সে। খুনের দায় নিজে নিয়ে নিলো যাতে বাবার সম্মান বজায় থাকে, তাতে তারও সম্মান রক্ষা হলো। কিন্তু তার বাবা এই গ্লানি সহ্য করতে পারেনি, ল্যাবে তার মৃত দেহ পাওয়া গেল। সায়ানাইড খেয়েছে।

ফজর আলীর প্রতি প্রফেসরের একটা মায়া আছে, কারণ তারা দুজনেই নিকট আত্মীয়ের সম্মান মর্যাদার জন্য জেলে এসেছে। একজন খুন না করেও খুনী হয়েছে, একজন চুরি না করেও অপরাধী হয়েছে। একজন নিজের পরিচয় ত্যাগ করেছে পিতার জন্য আরেকজন পুত্রের জন্য। প্রফেসর ফজরের দিকে আদেশের সুরে বলল, আমি বসছি, তুমি আমার কাঁধে দাঁড়াও।'

'এত বড়ো বেয়াদ্দপী আমি ক্যামনে করি স্যার?

প্রফেসর ধমক দিয়ে বললেন, 'বেশি কথা বলো না, সময় কম। তাড়াতাড়ি করো।'

ফজর দ্রুত হাঁটু ভাঁজ করে প্রফেসরের পা ছুঁয়ে নিলো, মাথা নিচু করে বলল, "যেই হাত দিয়া আপনের পা ছুইছি, সেই হাতটা আমি আমার পোলার কপালে ছোঁয়ামু, সেও যাতে আপনের মতো মানুষ হইতে পারে।

প্রফেসর তার আবেগ দমন করে আবার তাড়া দিলো, ফজর সাবধানে প্রফেসরের কাঁধে পা দিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। দেয়ালের ঐপাশে নামার আগে সে প্রফেসরের দিকে তাকালো, একই সাথে তার চোখে জল এবং প্রশস্ত হাসি দেখতে পেলো প্রফেসরের মুখে। পাগলা ঘণ্টা তখনো বেজে চলেছে, আসলেই উন্মাদের মতো বাজছে।

মহিলা ওয়ার্ডের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে বড়ো রাস্তা পার হয়ে ঝোপঝাড়ে ভর্তি জঙ্গলে ঢুকলো তারা। অন্ধকারে উল্কার মতো ছুটে চলেছে চারটি মানুষ। কাটার ঝোপে চামড়া ছড়ে রক্ত ঝরছে, সাপ-খোপ সমৃদ্ধ জঙ্গলে সব ভয় মাড়িয়ে তারা বোধহীনভাবে দৌড়াচ্ছে শুধু। তাদের পেছনে তাড়া করা একঘেয়ে ঘণ্টার শব্দটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

১২

দাওয়ায় বসে একটা নেড়ি কুকুর তার ঘা চাটছে। আমেনা দরজা খুলতেই সেটা ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে উঠানে নেমে তার ঘা চাটা অব্যাহত রাখলো। মজিদ আর রোশনী এখনো ঘুমিয়ে আছে, এখন আর গঞ্জে যেতে হয় না তাদের। আমেনা বসে বসে স্মৃতিচারণ করে, ফজর আলী নাক ডেকে ঘুমাত, সে ঘর ঝাড়ু দিতো, মজিদ লাটিম, নাটাই নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত। সেদিনগুলোতেও আমেনার মনে হাজারটা অপ্রাপ্তি ছিল, অভিযোগ ছিল, দুঃখ ছিল, হয়তো একটুখানি সুখও ছিল। কিন্তু এখন চিন্তা করলে সেই একটুখানি সুখই অপ্রাপ্তি, অভিযোগ দুঃখগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। কুকুরটার চিৎকারে আমেনার ধ্যানভঙ্গ হলো। লুঙ্গির সাথে খাকি শার্ট পরা দুজন লোক এসেছে, তাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে রাইফেলের নল দেখা যাচ্ছে, তাদেরই একজন কুকুরের পিঠে লাথি বসিয়ে দিয়েছে, অস্ত্র পিঠে থাকলে মানুষের পা শিরশির করে, শুধু লাথি দিতে ইচ্ছা হয়। আমেনার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠলো। একদৃষ্টিতে চোখ বুলিয়েই লোকগুলোর লালসা পরিসংখ্যান করে নিলো আমেনা। ঘোমটাটা মাথায় উঠিয়ে দিয়ে একটু আড়াল করে বসে বলল, 'কারে চান আপনেরা?'

দুজনের মধ্যে পেটমোটা লোকটি বলল, 'ঘরে পুরুষ মানুষ আছে?

আমেনা সংকোচে বলল, "না, ঘরে পুরুষ মানুষ নাই। আপনেরা কার কাছে আইছেন?'

পেটমোটা লোকটি নিতান্ত আপন ঘরের মতো দাওয়ায় বসে পড়ল, বলল, 'পুরুষ মানুষ নাই হেইডা জানি। সোনাদানা আছে কিছু?

'আমরা গরীব মানুষ-খানাদানা পাই না, সোনাদানা পামু কই।'

'খানাদানা নাই তো কী হইছে, গণ্যিমান্যি লোকেরা কি মরছে নাকি? তারা তোমাগো দেখবো, কলিম বেপারী খবর পাঠাইছেন, তোমাগো নিয়া যাইতাম, খানাদানা, সোনাদানা সবকিছুর ব্যবস্থা হইবো। ঘরে আরেকটা মাইয়া আছে না? হে কই?

আমেনার মাথা ভনভন করে ঘুরতে লাগলো, সে কিছু বলতে পারছে না। তাকে ধরে নিয়ে গেলে মজিদের কী হবে? না প্রাণ থাকতে সে কিছুতেই যাবে না। আমেনা ঝট করে

ঘুরে ঘরে ঢুকতে চাইলো। কিন্তু চিকন লোকটি তার শাড়ির আঁচল ধরে ফেলল, আঁচল নিয়ে টানাটানিতে আমেনার হাত চলে এলো লোকটার হাতে। আমেনা অন্যহাতে ঘরের পাল্লা ধরে রইলো। অমানুষিকভাবে চিৎকার করছে সে। ভেতর থেকে রোশনী দৌড়ে বেরিয়ে এলো, মজিদ কিছু না বুঝে কাঁদছে। রোশনী আমেনাকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেও ধরা পড়ল। আমেনার হাত পাল্লা থেকে পিছলে যাচ্ছে।

১৩

সুজনের প্রলাপে ফজরের হুশ এলো। হাত বাড়িয়ে সুজনের কপালে হাত দিয়েই তার কপালে ভাঁজ পড়ল। জ্বরটা আবার ফিরে এসেছে। তার পাশে ইউসুফ আর বাচ্চু মরার মতো পড়ে রয়েছে। গতরাতে কত মাইল দৌড়েছে, কত দেশ পেরিয়েছে কেউ বলতে পারে না। এই নীরব তল্লাটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে শুয়ে পড়েছিল চারজনই। ঘুমিয়েছিল কিংবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ফজর চোখ খুলে দেখলো, আলো ফুটেছে কিন্তু পাখি ডাকছে না। ভোরের আলোতে তাদের রাত্রী নিবাসের স্থানটি সমীক্ষা করতে গিয়ে বুঝলো, তারা একটি বাগানে আছে। বাগানে মেহগনী গাছ ভর্তি। বাগান পেরিয়ে একটা ঘর দেখলো, ছন দিয়ে ছাওয়া কুঁড়েঘর কিন্তু কোনো জনমানব কিংবা জনমানবের লক্ষণ চোখে পড়ল না।

ইউসুফ আর ফজর সুজনকে টেনে সেই কুঁড়েঘরটাতে নিয়ে এলো। একটি চাটাই পাতাই ছিল ঘরে, চাটাইয়ে শুইয়ে দিলো তাকে। বাচ্চু এসব কর্মযজ্ঞে যোগ দিলো না, সেও সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েই অনুযোগের সুরে বলল, 'ভুখ লাগি হ্যায়।'

ইউসুফ আর ফজরের পেটও সে অনুযোগে সাড়া দিলো। ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখলো, রান্না করার কোনো সামগ্রীই এখানে নেই। কয়েকটা লুঙ্গি কুর্তা ঝুলে আছে। এই ঘরটা হয়তো রাতে বাগান পাহারা দেয়ার জন্যই বানানো হয়েছে। এমনকি খাওয়ার জন্য পানিও নেই, একটি কলসি নির্লজ্জভাবে এক কোণায় উল্টে আছে। তারা মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু করলো, ফজর বলল, আমি গিয়া দেখি, কোনো খাওন পাওন যায় নাকি?

বাচ্চু আসন্ন ভোজনের অপেক্ষায় চোখ মুদে বলল, আচ্ছা বাত।

ইউসুফ মুন্সি ফজরকে থামিয়ে বলল, "এইখান থেইকা লুঙ্গি কোর্তা পইরা যা। সাবধানে যাইস। কেউ জিগাইলে কবি, মুসাফির।

ফজর ইউসুফ মুন্সির উপদেশ খুব ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে এগুতে লাগলো গ্রামের দিকে। নিজের মুসাফির পরিচয় দেয়ার মতো কাউকে পাচ্ছে না সে। একটা

মাঠ পেরুলো, মাঠে দাড়িয়া বান্ধা খেলার জন্য দাগ কাটা আছে, কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নজরে এলো না। হাঁটতে হাঁটতে খালের পাড়ে চলে এলো। সুদূরে দৃষ্টি দিয়ে অবাক হয়ে গেল সে, অন্ধকার কালো নির্জীব এক গ্রাম দেখা যাচ্ছে। যেন গ্রাম নয়, গভীর নদীর কালো পানিতে গ্রামের ছায়া।

ফজর হাঁটতে হাঁটতে পোড়া ঘরগুলি দেখছিল, কিছু কিছু ঘরের সামনে তুলসী গাছের বেদী এখনো অক্ষত আছে। এই কয়েকটা তুলসী গাছ ছাড়া গ্রামে জীবন্ত কিছু চোখে পড়ল না। এগুতে এগুতে পঁচা বোটকা একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারলো। ফজর বুঝলো না গন্ধটাকে এড়াতে গিয়ে আরো কাছে চলে যাচ্ছে সে। বুকটা তড়াস করে উঠলো তার, জামরুল গাছের নিচে ঠেস দিয়ে আছে একটি উলঙ্গ মহিলা। তার পরনে শুধু চুলের সিঁথিতে দেয়া লাল সিঁদুর ছাড়া আর কিছুই নেই। কয়েকটি মাছি মহিলাটির নাকের সামনে ভনভন করছে, আরো কয়েকটি মাছি বুকের স্তনহীন ক্ষতে। দুদিন পুরনো এই লাশ থেকেই গন্ধ ছড়াচ্ছে। ফজর চিৎকার করে ছুটে চলেছে, লাশটি থেকে যতদূর যাওয়া যায়। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই মহিলাটির ছবি ভেসে উঠছে, হাজার মাইল দৌড়েও মনের ভেতর থেকে এই বিভীষিকা থেকে দূরে যেতে পারবে না সে।

ছুটতে ছুটতে কিছু একটার সাথে তার পা ধাক্কা খেয়েছে, সামলাতে পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। মাথা তুলে দেখলো, নির্জীব একটা আট-নয় বছরের ছেলে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটির বুকে কালচে রক্ত। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, এক লাশ থেকে ছুটে পালিয়ে সে লাশের মিছিলে এসে পৌছেছে। চারদিকে লাশ আর লাশ। তাজা লাশ, গলা লাশ। কোনো লাশের চোখ খোলা, কোনো লাশের চোখই নেই। শিশু লাশ, বুড়ো লাশ, নারী লাশ, পুরুষ লাশ, সবাই একসাথে শুয়ে আছে। আবার ছুটতে লাগলো ফজর। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে ছুটছে সে, কিন্তু লাশের সে মিছিল পার হতে পারছে না।

দরজায় বিধ্বস্ত ফজরকে দেখে ইউসুফ আর বাচ্চু দুজনেই চমকে উঠলো, সুজনের জ্ঞান থাকলে সেও চমকে উঠতো। ফজর শীতল গলায় বলল, ‘খাওন নাই, লাশ আছে।'

কিছু কথায় আর বাকিটা হাতের ইঙ্গিতে ফজর তার বিভীষিকার বর্ণনা করলো। ইউসুফ মুন্সির মনে কোনো সন্দেহই রইলো না, এই জুলুম মুক্তিদের কাজ। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, ‘হিন্দুগুলানের কইলজা দেখছো? মুক্তি হইয়া মুসলমান মারে।

ফজর বাধা দিয়ে বলল, “সব তো মনে হয় হিন্দু লাশই দেখলাম হুজুর।

‘তুমি ঘোরে কী দেখতে কী দেকছো কে জানে! আর হিন্দু দুয়েকটা মরলে ভালোই!'

বাচ্চু অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো, শোয়া থেকে উঠে বলল, “ইসব আলাপের গুষ্ঠী কিলাতা হো, ইধার সে চলেন যাইগা। ভুখ লাগা হ্যায়।

ফজর বলল, ‘সুজন মাস্টারের জ্বর কমলে যামুনে, এহন তো হে উইঠ্যা খাড়াইতেই পারবো না।'

বাচ্চু সুজনের দিকে খুব বিরক্ত হয়ে তাকালো, “ইসকে লিয়ে হাম কিউ মরে? আমার ভুখে জান বাহির হোতা হ্যায়। কেউ না গেলে, আমি একলা যায়েংগে।'

ইউসুফ বাচ্চুর মূল সুর এড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই ভুলভাল উর্দু কতা ক্যান কও। বাঙালি হইয়া ক্যান তুমি পাঞ্জাবী সাজতে যাও? হয় এক্কেরে উর্দুতে কতা কও নাইলে বাংলায় কও। নাইলে চুপ কইরা থাইকো।

কেউ যেন বাচ্চুর পরিধেয় কেড়ে নিলো, বাচ্চু যেন জনসম্মুক্ষে উলঙ্গ হয়ে গেল, সে ভাবতো তার উর্দু দক্ষতায় সবাই বিমোহিত এবং তার প্রতি সবার মনে একটা সম্ভ্রমের সিংহাসন হয়ে গেছে। এভাবে সিংহাসন বিচ্যুত হয়ে নগ্ন হয়ে যাওয়াতে সে যতটা না লজ্জা পেলো তার চেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলো। সে ইউসুফ মুন্সির দিকে অগ্নিদৃষ্টি দিলো, চোখ দিয়ে যদি সত্যই আগুন বের হতো এতক্ষণে সে আগুনে ইউসুফ মুন্সি ভস্ম হয়ে যেতো। ইউসুফ মুন্সি বহাল তবিয়তে বসে আছে, ফজরও ইউসুফ মুন্সির কোনো প্রতিবাদ করেনি। বাচ্চু আর কিছু বলল না, হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বের হয়ে যাওয়ার সময় অভিশাপ দিয়ে গেল, মরো তোম বাঙালি লোক।'

ফজরের ধারণা ছিল বাচ্চু ফিরে আসবে কিছুক্ষণ পর কিন্তু বাচ্চু ফিরলো না। ইউসুফ মুন্সি কোথা থেকে কাঁচা এক কাঁদি কলা নিয়ে এলো। আগুন জ্বালিয়ে সেগুলো পুড়ে খেলো দুজনে। সুজনকেও খাওয়ালো, কিন্তু সুজন খুব বেশিক্ষণ তা পেটে রাখতে পারলো না, বমি করে দিলো। জ্বর বাড়ছেই তার। কপালে হাত রাখলে হাত পুড়ে যায়। অবস্থা। ফজর কাপড় ভিজিয়ে পানি পট্টি দিলো কপালে, কিন্তু কোনো লাভ হলো না, জ্বর কমে না।

রাতে ফজর বসে বসে কীভাবে বলরামপুর যাবে সে চিন্তাই করছে। ইউসুফও হয়তো বাড়ি ফেরার কথা চিন্তা করছে। সুজনের গলার শব্দে দুজনেরই ধ্যান ভঙ্গ হলো। ফজর সুজনের কপালে হাত দিয়ে দেখলো জ্বর কমেনি। সুজন বলল, কেমন ঝম ঝমাইয়া বিষ্টি নামছে।

ফজর বৃষ্টির কোনো আলামত দেখলো না। সুজনের চোখগুলো কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে।

সুজন ফজরের দিকে তাকিয়ে কাতর ভরা গলায় বলল, “আমি মইরা যামু, তাই না ফজর ভাই?

‘না মরবা ক্যান, তুমি আমার লগে আমার বাইত যাইবা। আমেনার হাতের শাপলা ছালুন খাওয়ামু তোমারে, তহন বুজবা বেহেশতী খানা কী জিনিস!'

‘না ভাই, আমি মুক্তি হমু।'

‘তুমি মুক্তি হোওনের লাইগা এতো ফাড়াকাড়ি লাগাইছো ক্যান?

‘ভাই আমি দেখছি। আমদানি ঘরে যহন মুক্তিগো গুল্লি করে, তাগো চোউখ বাইন্ধা দেয়। গুলি চলনের আগে তারা শইল্যার সব শক্তি দিয়া একটা কতা কয়। হুইন্যা পশম খাড়াইয়্যা যায়।'

‘কী কয়?'।

‘জয় বাংলা। তুমি দেহো নাই ভাই, মরণের পরেও তাগো মুহে। কেমুন মায়া লাইগা থাহে। মনে অয় যেন, মার কোলে মরছে। আমিও মার কোলে মরবার চাই গো ভাই। মার

কতা ভুইল্যা গেছি, মায়রে মনে করবার চাই। আমি মুক্তি হমু ভাই।'

ফজর সান্ত্বনার সুরে বলে, "আইচ্ছা হইবা। এহন ঘুমাও বাই।'

'না ভাই তুমি আমারে কও, ভালা কইরা কও, আমি মুক্তি হমু। তোমার পোলার কসম দিয়া কও, আমি মুক্তি হমু।

ফজর মাথা নিচু করে রইলো, তা দেখে সুজন যেন আরো ক্ষেপে গেল। বলল, কও বাই কও, তাইলে একটু শান্তি লাগবো আমার।'

ফজর বলল, 'আইচ্ছা, তুমি মুক্তি হইবা। তোমার নাম হইবো মুক্তি সুজন।'

সুজনের মুখে প্রশান্তির আভা দেখা গেল। সে ঘুমিয়ে পড়ল। ইউসুফ মুন্সি বিরক্ত হয়ে ফজরকে বলল, যেই কতা রাকতে পারবা না হেই কতা দিলা ক্যান?' ফজর মাথা নিচু করে বলল, "জানি না হুজুর।

শেষ রাতে সুজনের জ্বর একেবারে সেরে গেল। সে উঠে বসলো, ঠেলে ঠেলে ফজর আর ইউসুফ কে উঠালো। হাসিমুখে বলল, "খুব ভালা লাগতাছে এহন। সকাল সকাল বাইর হইয়া যামু আমরা। নালিন্দাবাড়িত মুক্তিগো ক্যাম্প আছে, হেদিকে গিয়া নাম লেখামু।'

ইউসুফ মুন্সির খুব বিরক্ত লাগছে এসব শুনতে। সে বিরক্ত হয়ে শুধু বলল, 'জয় বাংলা তোমার মাতা খাইছে।'

ফজর হাসিমুখে বলল, "ঠিক আছে, বেইন্যারটা বেইন্যা দেহন যাইবো। অহন একটু ঘুমাও, শইলডা ভঁজে পরুক।'

সুজন শুয়ে পড়ল। ভোর হওয়ার আগেই সুজনের গায়ে প্রচণ্ড জ্বর এলো। এলোমেলো বকছে সে, শুধু "মা মা' করছে। ফজর আলী কপালে হাত দিয়ে ভয় পেয়ে গেল। পানিপট্টি দিলো আবার। সুজন এরমধ্যে দুবার বমি করেছে, পেটে কিছু নেই তার, তবুও বমি হয়েছে। মাকে ডাকতে ডাকতে সূর্য উঠার আগেই মারা গেল সুজন। সকাল আর দেখা হলো না তার।

ইউসুফ মুন্সি সুজনের জানাজা পড়ালো, তার পেছনে ফজর! ফজর আবার কোদাল হাতে নিলো, আবার কবর খুড়লো সে। সুজনকে শুইয়ে দিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। বৃষ্টিতে পথে ঘাটে মাঠে সবখানে প্যাচপ্যাচে কাদা জমেছে। কাদাপথ মাড়িয়ে তারা হেঁটে চলেছে, পথের বুকে পদচিহ্ন এঁকে তারা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জেলখানায় যাওয়ার আগে তারা যে পৃথিবী রেখে গিয়েছিল এটা সেই পৃথিবী নয়। মাঠ থেকে কেউ হাঁক ছেড়ে ডাকছে না, গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের কান্না আর মায়েদের শাসন শোনা যাচ্ছে না। রাস্তায় বৃদ্ধরা অকারণ কৌতূহল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছে না, কেডা গো তোমরা? কোন বাড়ির কুটুম?'

সবকিছু কেমন যেন অসম্ভব নীরব আর নিস্তব্ধ। রাস্তায় দুই একটি মানুষ যদিওবা দেখেছে কেউ ভয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। রতননগর পৌছালো তারা, অনেক নাম শুনেছে এই গ্রামের। জেলার সবচেয়ে বড়ো হাট বসে রতননগর গঞ্জে। হাটের দিন নাকি বড়ো বড়ো মানুষরাও হারিয়ে যায় এই গঞ্জে। হাটেরদিন ছাড়াও প্রতিদিন ভিড় লেগেই থাকে। স্টিমার ঘাট আছে একটা গঞ্জের পাশেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন পণ্য আসে। সুন্দরবনের বাঘের চামড়াও নাকি আসে এই গঞ্জে। জমিদার জোয়ারদারেরা শখের বসে কিনে নিয়ে যায়। গঞ্জের পাশেই পৌষ মাসে যাত্রাপালার দল আসে আর মাঘ মাসে আসে সার্কাস দল। অথচ এখন কে বলবে এটাই সে রতননগর গঞ্জ, আজ আবার হাটবার। দুই একটি কুকুর এদিক সেদিক ঘুরছে, তাদের আচরণে কোনো আলস্য নেই, কেমন ভীত একটা ভাব। মানুষজন চোখে পড়ছে না। সব মানুষ গেল কোথায়? গঞ্জের টুকার রাস্তায় একজন মানুষ দেখা গেল। মানুষ না বলে ময়লার আখড়া আর উকুনের কারখানা বলাই ভালো। চুল দাড়ি জট পাকানো লোকটির দাড়িতে ভালো করে লক্ষ্য করলে খালি চোখেই দুই একটি উঁকুন দেখা যায়। লোকটির গায়ের গন্ধে টের পাওয়া যায়, ইহজীবনে পানির স্পর্শ পায়নি তার শরীর। ইউসুফ মুন্সি লোকটা থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে বলল, “মানুষজন সব কই? আইজ হাটবার না?

পাগল লোকটি ইউসুফের দিকে তাকিয়ে চক্ষু পাকিয়ে বলল, ‘বেবাক মানুষ ঘুমায়। তোর বন্দুক কই?

‘বন্দুক নাই, বন্দুক থাকবো ক্যান?

‘বন্দুক না থাকলে শুইয়া থাক, ঘুমাইয়া যা।'

‘কী আবোল তাবোল কতা!'

‘মুসলমানি হইছে তোর?

ইউসুফ মুন্সি আর কথা বাড়ালো না, লোকটির কথাবার্তা বিপদজনক দিকে মোড় নিচ্ছে। হন হন করে হেটে গঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারা। লোকটি চেঁচিয়ে পেছন থেকে বলছে, ‘শব্দ করিছ না, মাইনষে ঘুমায়। আস্তে আস্তে যাইছ। মন কাড়া না থাকলে মুচির থেইক্যা কাইট্যা লইয়া আয়।

গঞ্জ পার হতেই বিকট এক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত হলো তারা। খালের পাড়ে খেজুর গাছের নিচে গুড়ের দোকানের মতো মাছির মেলা বসেছে। উৎকট গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে। কিছু কুকুর আনন্দে ঘেউ ঘেউ করছে। আট দশটা মানুষকে চালের বস্তার মতো স্তুপ করে রাখা হয়েছে। একটা কুকুর গভীর অধ্যাবসায়ের সাথে এক বৃদ্ধের হাত কামড়াচ্ছে। হাতটা প্রায় টেনে ছিড়ে ফেলেছিল, কিন্তু জীবিত মানুষদের উপস্থিতিতে কর্ম সম্পন্ন করতে পারলো না। একটু দূরে গিয়ে জিহ্বা ঝুলিয়ে পা গুটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ইউসুফ মুন্সির পেটে পাক দিলো, হাত পা অবশ হয়ে গেল। পেটে হাত রেখে হড়হড় করে বমি করতে লাগলো সে। কিন্তু ফজর চমকালো একটা পাঁচ বছরের বাচ্চার লাশ দেখে। মুখ থুবড়ে পরে আছে লাশটা, ফজরের বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। হাতদিয়ে উল্টালো লাশটি। মুহূর্তেই পেছনে সরে গেল। নাক ঠোট কিছুই নেই, নরম মাংস কুকুরেরা আগেই সাবাড় করেছে। ইউসুফ মুন্সি উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ লাশটির দিকে তাকিয়ে থেকে দাতে দাত ঘষে স্বগোক্তি করলো, “শালা মুক্তির বাচ্চারা।

ফজর আলী উপরে তাকিয়ে আছে, সম্ভবত আকাশ দেখছে। তুষ ঢালার পর চুলার আগুন যেমন বহুগুণে বেড়ে উঠে, তারপর আবার ধিকিধিকি জ্বলে, ফজরের বুকেও তেমন একটা আগুন সর্বদাই জীবন্ত। লাশটা দেখে তার বুকের আগুনটা যেন উসকে

উঠলো। সুজন মৃত্যুর আগে বৃষ্টির শব্দ শুনেছিল, হয়তো তার বুকেও এমন একটা আগুন ছিল, তার আগুন নিভে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। ফজর আলী আকাশে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির অপেক্ষায়।

***

বলরামপুরের পাশের গ্রাম নিশিকান্দিতে ইউসুফ মুন্সির বাড়ি। আড়াইদিন হেঁটে ইউসুফ মুন্সি আর ফজর নিশিকান্দি গ্রামের প্রান্তে এসে পৌছালো। উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে ইউসুফ মুন্সির। তার মেয়েটা বাজানকে দেখে কেমন খুশি হবে, ছেলেটা নিশ্চয়ই লাফ দিয়ে কোলে উঠবে, আর তার বউ ফাতেমা সে কি আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে দেবে। তার বাবা ঝাপসা চোখে তাকে দেখে নিশ্চয়ই চিনতে ভুল করবে না। মা তো জড়িয়ে ধরেই বিলাপ করবে। মসজিদের পেছনে হিজল বনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কে যেন ইউসুফ কে ডাকলো। ইউসুফ গলা শুনেই বুঝলো তার বৃদ্ধা মায়ের গলা। হিজল বনের ভেতর থেকে মায়ের গলা শুনে অবাক হয়ে গেল সে। দিনের বেলাতেও এই বনে কেউ যায়, এইখানে খারাপ জ্বীনদের বসবাস। কিন্তু মায়ের ডাককে অগ্রাহ্য করতেও পারছে না সে। ভেতর থেকে অনেকগুলো গুমোট ফিসফাস শব্দ ভেসে আসছে। ইউসুফ মুন্সি সুরা ইউনুস পড়ে বুকে ফু দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। তার মা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। ইউসুফ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, গ্রামের অনেক মানুষ এখানে এসে জমায়েত হয়েছে। ভয়াল দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে, প্রচণ্ড বিপদে কেউ কেউ অভ্যাসমতো ঘুমিয়ে আছে। মরলে ঘুমের মধ্যেই মরতে চায় তারা। ইউসুফের বৃদ্ধা মায়ের পাশে তার নয় বছরের ছেলেটিও আছে। সে তার বাজান' কে দেখে অবাক হয়েছে কিন্তু খুশি হয়েছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। বৃদ্ধা পুত্রদর্শনে আবেগ তাড়িত হয়ে কাঁদতে বসে গেল। কান্নাটা একটু জোর পেতেই সবাই মৃদু ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলো। ইউসুফ তার মা কে বলল, “কী হইছে মা, বেবাক মানুষ এই জ্বীনের আস্তানায় ক্যান?

‘বাবাগো জানোয়ারের দল আইসা সব জ্বালাইয়া দিছে। আশ (হাঁস)-মুরগার লাহান মানু মারতাছে।'

ইউসুফের চোখে এক রাশ রক্ত এসে ভর করলো, বলল, ‘মুক্তিরা এইহানেও আইয়া পড়ছে?

ইউসুফ মুন্সির মা পুত্রের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল, কথার সুরটা ধরতে পেরে বলল, ‘মুক্তিরা না রে বাজান, পাকি জাননায়ারেরা সব জ্বালাইছে। মুক্তিরা তো সব আমাগো পোলাপান।

ইউসুফ কথাগুলো হজম করতে পারলো না, মাথার উপরে আকাশটা যেন খান খান করে ভেঙ্গে গেল। মায়ের কথাগুলো নিজের মনেই দুয়েকবার আওড়ে নিলো, ভুল শোনেনি তো? নিজেই নিজেকে বারবার অবিশ্বাসের সুরে বলতে লাগলো, পাকিস্তানিরা মুসলমানের গেরামে আগুন দিছে? মুসলমান মারছে?

হঠাৎ তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো, বলল, “মা, ফাতেমা কই? আর আমার মাইয়া জুলেখা কই? আব্বারে দেহি না কেন?'

‘তোর বাপেরে মাইরা লাইছেরে পুত।'

ইউসুফ মুন্সির নিঃশ্বাস আটকে এলো, কিন্তু শোক করার অবকাশ নেই, মাকে আবার বলল, ফাতেমা আর জুলেখা কই?

বৃদ্ধা কেঁদে উঠলো, তোর বউ আর মাইয়ারে ক্যাম্পে ধইরা নিয়া গেছে পাঞ্জাবীরা।'

বৃদ্ধা জুলেখার পরিধেয় শাড়িটি গুটলি করে বুকে নিয়ে রেখেছিল, সেটা ইউসুফের দিকে এগিয়ে দিলো। এই শাড়িটিই পরে ছিল জুলেখা, এখনো তার গায়ের গন্ধ লেগে আছে তাতে। পাঞ্জাবীদের শাড়ির প্রয়োজন নেই। খুলে রেখে গেছে।

ফজর চেয়ে দেখলো ইউসুফ মুন্সির চেহারাটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। মুন্সির এই চেহারা ফজর আগে কোনোদিন দেখেনি। হিংস্র ভয়ানক একটা চেহারা, চোখ মুখ ফেটে যেন রক্ত ঝরে পড়বে। মুন্সির মুসলমানী বিশ্বাসের সাথে এতবড়ো প্রতারণা সে সইতে পারছে না। হাতের পেশীগুলো ফুলিয়ে, হিজল গাছের ভাঙা একটা ডাল হাতে নিলো। ইউসুফ মুন্সি। পাগলের মতো গুল্ম, ডালপালা ভাঙ্গতে লাগলো, যেন একটা ঝড় সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। ডালপালার উপর প্রলয় শেষ হতেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বসে পড়ল। মেয়ের পরিধেয় শাড়িটি হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। পেছনে

সবাই ‘হায় হায়’ করে উঠলো। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে ফেরানোর চেষ্টা করলো। কেউ কেউ বৃদ্ধাকে চুপ করার জন্য ধমক দিলো। কেউ কেউ বলে উঠলো, ‘আটকাও মুন্সিরে আটকাও। কিন্তু আটকানোর লক্ষণ কারো মধ্যে দেখা গেল না। ফজর আকস্মিক এসব ঘটনায় হতবিহ্বল হয়ে ছিল। সম্বিৎ ফেরা মাত্রই সে ছুটলো ইউসুফ মুন্সির পেছনে।

নালিন্দাবাড়ি গ্রামের সীমানায় প্রকাণ্ড তেতুল গাছের নীচে এসে ফজর ধপ করে বসে পড়ল। ইউসুফ মুন্সির উন্মাদ পা জোড়ার কাছে পরাজিত হয়েছে সে। ইউসুফ মুন্সি মাঠ পেরিয়ে ঘন সবুজ বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। বৃক্ষ রাশির উপরে লম্বা বাঁশের মাথায় সাদা সবুজ পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে। সেখানেই পাকিস্তানি আর্মিরা ক্যাম্প করেছে। ফজর আলী হাঁপাতে লাগলো, মাঠ পেরুলো না, সে ঘুরে চলল বলরামপুরের দিকে। দেশে সবাই বিপদে আছে, প্রাণ নিয়ে পথে পথে ঘুরছে। আমেনা আর মজিদ না জানি কেমন আছে?

১৪

ফজরের মনের আশংকা সত্য হলো, শূন্য বাড়ি খা খা করছে। দরজার একটা কপাট ভেঙ্গে দুলছে। ফজরের বুকটা ছ্যাত করে উঠলো। ভয়ে ভয়ে ভেতরে গিয়ে তার পরিবারের সন্ধান করলো এবং হতাশ হলো। উঠান শুকনো পাতায় ভর্তি, আমেনার ঝাড়ুর ছোঁয়া পায়নি উঠান। মজিদের সাম্প্রতিক কোনো দুষ্টুমির চিহ্নও খুঁজে পেলো না ফজর। তার নিজের বাড়িটি নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকছে। মোল্লা বাড়ি থেকে হুরমতির কোলাহল শোনা যাচ্ছে না, এই প্রথম মোল্লা বাড়িটি এতো নিস্তব্ধ হয়ে আছে। হুরমতির অনুপস্থিতি নিয়ে কোনো সন্দেহ রইলো না ফজরের মনে। কাকে জিজ্ঞাসা করবে করবে আমেনার কথা, কোথায় আছে তারা? নিজের ভেতরে চুরমার করে দেয়া কী যেন একটা গলা ঠেলে বের হতে চাইছে। ফজর এলোমেলো পায়ে কদম গাছ দুটির নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এই গাছ দুটির কাছে তার অনেক অভিযোগ, গাছগুলোও বিমর্ষ হয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনে ফজর কদম গাছে থেকে সেদিকে নজর দিলো। বাড়ি থেকে নেমে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখলো, পাশের বাড়ির বুড়ি খালা পথে বসে পা ছড়িয়ে বিলাপ করছেন। তার সাদা চুল কোনোকালেই ঠিক গোছানো ছিল না। কিন্তু আজ যেন একটু বেশিই এলোমেলো। বিলাপ করতে করতে নিজের দুঃখের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে, ‘মাইয়াডারে লাইগা কতো ভালা ভালা সম্বন্ধ আইছিল, পৌষ মাসে বিয়া দিমু ঠিক করছিলাম। অহন কেডা বিয়া করবো আমার মাইয়ারে, গোলামের পুতেরা আমার মাইয়াডারে নষ্ট করছে গো আল্লাহ। তাগো চৌদ্দ গুষ্ঠির কুষ্ঠ হইয়া মরবো। ফজরকে দেখে বিলাপে বিরতি দিয়ে খানিক চেয়ে রইলো। বলল, “অ কেডা রে, ফজর নাহি? জেল থুন ছাড়া পাইছস রে ফজর? তারপর আবার কেঁদে কেঁদে ফজরের কাছে নিজের দুঃখ বর্ণনা করলো।

ফজর অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, খালা মজিদ আর মজিদের মায় কই?

‘বেবাক মাইয়াগো গোলামের পুতেরা ক্যাম্পে ধইরা লইয়া গ্যাছে। পুরুশ মানুষ পাইলে গুল্লি করতাছে। তুই জেল থেইক্যা ক্যান আইলি। এই দোজখের থেইক্যা জেলখানা মেলা

ভালা।।

বৃদ্ধার কথাগুলো যেন ধারালো তরবারি হয়ে ফজরের বুকে গেঁথে গেল। দম আটকে গেল, বাতাস ফুরিয়ে গেল। মাথার ভেতর রক্তগুলো যেন পাগল হয়ে উঠেছে, ছলকে ছলকে বিদ্যুৎ হয়ে বজ্রপাত করছে। পাগুলো ছুটতে শুরু করলো, ফজর জানে না সে কোথায় ছুটছে। তবে তার পা জানে কোথায় যেতে হবে।

***

ক্ষমতা থাকলে প্রয়োগ করার জন্য মানুষ উশখুশ করে। পাকিস্তানি আর্মিরা কিংবা রাজাকাররা মানুষ মারার ক্ষমতা পেয়েছে কিন্তু মারার জন্য মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না, সব পালিয়েছে। বিনোদনের জন্য ক্যাম্পে আটকে রাখা পনেরো বিশটা মেয়েই ভরসা। বিনোদনের আকালে ভুগছে তারা। ফজর আলীকে পেয়ে সবার চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিলো। কদম হোসেন ক্যাম্পের পাশ থেকে উড়ান্ত হয়ে ছুটে আসা ফজর আলীকে ধরলো প্রথম। তারপর থেকে নিজ কৃতিত্বে তার বুক দু ইঞ্চি ফুলে গেছে। ফজরের পেছনে পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে যখন আনছিল সে তখন বাকি রাজাকারদের গর্ব করে বলছিল, আমার চোউক ফাঁকি দিবো, এত্ত হস্তা না। বউ খুঁজতে আইছে ইউসুফ মুন্সির লাহান।

ক্যাম্পের মাঝখানে জটলা হয়ে আছে। চেয়ার পেতে পাঞ্জাবীরা বসে আছে জটলা পাকিয়েছে। বাঙালি বন্দুকধারীরা দাঁড়িয়ে আছে, পাকিস্তানি প্রভুদের সামনে বসার চিন্তাও করতে পারে না তারা। রাজাকার কমান্ডার কলিম বেপারীও দাঁড়িয়ে আছে ঘাড় নুইয়ে। তার এই বিনীত রূপ কখনো দেখেনি ফজর আলী। ফজর আলীকে নিয়ে কদম হোসেন জটলায় প্রবেশ করলো। ইউসুফ মুন্সিকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তার মেয়ের শাড়ি দিয়ে, তার শরীরে কোনো বস্ত্রখণ্ড নেই। দুই পা এক সাথে চেপে ইউসুফ মুন্সি নিজের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। সবাই খুব মজা পাচ্ছে, বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়িওয়ালা একটা লোককে সচরাচর ন্যাংটো দেখা যায় না। উঁকি দিয়ে এক নজর দেখে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে একেকজন। একজন রসিক তো, দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, “হুজুরের খেজুর দেহা যায়!'

ইউসুফ মুন্সি চোখ বন্ধ করে শুধু আল্লাহকে ডাকছে। বিনোদনে ফজর আলীর সংযুক্তিতে ক্যাম্পে উৎসবের ছটা ছড়িয়ে পড়ল। কদম হোসেন ফজরকে বেঁধে দিলো ইউসুফ মুন্সির সাথে। একজন এসে ফজরের মুখে দুটো লাথি বসিয়ে দিলো। ঠোট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কদম হোসেন ফজরের লুঙ্গিতে টান দিতে গেলে একজন পাকিস্তানি ধমক দিয়ে উর্দুতে বলল, 'সবর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়। ইসকা হিছাব কাল চুকায়েংগে।

ইউসুফ মুন্সির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "আজ ইস জনাব সে খেলেংগে। যাও ইসকি বিবি আউর বেটী কো লে আও।'

বিনোদন নতুন মাত্রা পেতে যাচ্ছে, সবগুলো চোখ চকচক করে উঠলো। জেনানা ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য একসাথে দুই তিনজন ছুটলো। সে ঘরের প্রতি আগ্রহ তাদের সর্বাধিক।

লালায়িত অনেকগুলো চোখের সামনে ফাতেমা আর তার মেয়ে জুলেখাকে হাজির করা হলো। এলোমেলো চুলগুলো বুকের উপর ছড়ানো। হাত দিয়ে নিজেদের উর্ধাঙ্গ ঢেকে রেখেছে তারা। কোমরে শুধু একটা গামছা জড়ানো। ইউসুফ মুন্সি তাকালো তার বউ আর মেয়ের দিকে। ঠোট জোড়া কেঁপে উঠলো তার, এখনো আল্লাহকে ডাকছে সে। ফাতেমা আর জুলেখা ইউসুফ মুন্সিকে দেখেও নির্লিপ্ত রইলো, তাদের জীবনে দূর্যোগের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। নতুন কোনো বিপদে তাদের বুক কাঁপে না। তারা লাশ হয়ে গেছে। তাদের চোখের দিকে তাকালে যে কেউ বলে দিতে পারবে অনেক আগে তারা মারা গেছে। শীতল চোখগুলো যেন বরফ হয়ে গেছে।

মা আর মেয়ের অর্ধনগ্ন শরীরগুলোর ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো চোখ। ইউসুফ মুন্সি এখনো কাঁপছে। তার কাঁপুনি দেখে পাকিস্তানি অফিসারটি শুকরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে উঠলো। পাশ থেকে কলিম বেপারী ব্যঙ্গ করে বলল, 'মাইয়ার সামনে হুজুরের খেজুর দেহা যাইতাছে, কেউ ঢাইকা দেও।'

অফিসারটি বাংলা পুরো বুঝে না, কিন্তু বেপারীর ইঙ্গিত ঠিক বুঝে গেল, তার মাথায় আরো শয়তানি খেলা করতে থাকলো। সে কলিম বেপারীর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আলবৎ।

বলেই ফাতেমা আর জুলেখার কোমর পেঁচিয়ে রাখা গামছা দুটো টান দিয়ে খুলে ফেলল। সে গামছা ছুঁড়ে ফেলল ইউসুফ মুন্সির দিকে। অকস্মাৎ এই ঘটনায় সবাই হতবাক হয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তেই অট্যহাস্যে ফেটে পড়ল। ইউসুফ মুন্সি চিৎকার করে উঠে, উপরের দিকে তাশিয়ে বলল, “আল্লা রহম করো, আমারে মরণ দেও।'

অফিসারদের অভিসারের জন্য আলাদা একটি ঘর আছে। সেখানে ফাতেমা এবং জুলেখাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আজ তাদের ভোগ করবে পাকিস্তানি অফিসারেরা। সবচেয়ে বড়ো অফিসারটি ঘোষণা দিলো, আগামীকাল সকালে মা-মেয়ের সামনেই ইউসুফ মুন্সিকে জবাই করা হবে। পাকিস্তানিটি রাত্রীকালীন সেবাগ্রহণের জন্য অভিসারঘরে চলে গেল। তার ভাগ্যকে ঈর্ষা করতে করতে সৈন্যরা এবং রাজাকারের দল জেনানা ক্যাম্পে সুযোগ খুঁজতে গেল। তবে সকলেই অপেক্ষা করতে লাগলো সকালের। নারীভোগের চেয়ে মানুষ জবাই কোনো অংশে কম উত্তেজনার নয়।

ইউসুফ মুন্সিকে যেখানে বাঁধা হয়েছে তার ঠিক পাশেই সেই অভিসার ঘর। একজন একজন করে অফিসার সেখানে ঢুকছে। চিৎকার শোনা যাচ্ছে ভেতর থেকে, ফাতেমা অথবা জুলেখার। মুন্সি প্রতিটা চিকারে নিজের হাতের মুঠো শক্ত করে দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরছে। সকালের অপেক্ষা করছে সে। ফজর আলী অপেক্ষা করছে বৃষ্টির।

***

‘ইউসুফ ভাই, ইউসুফ ভাই!

ফিসফিস গলায় কে যেন ডেকে উঠলো। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, দুই একটা শেয়াল আর সুফ ফজর ছাড়া বোধহয় পুরো পৃথিবী ঘুমাচ্ছে। এখন কে ডাকছে? ফজর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। অন্ধকারে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে, ছায়াটা তাদের দিকে এগিয়ে

আসছে। হাঁটু গেড়ে বসে শাড়ি দিয়ে বাঁধা ইউসুফের হাতের বাঁধন খুলছে। ইউসুফ মুন্সি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কে?

'হাম বাচ্চু।'।

ফজর আলীর বাঁধন খোলার পর তারা তিনজন উঠে দাঁড়ালো। বাচ্চুর গায়ে খাকী পোশাক। সে রাজাকার হয়েছে। সারাদিন সে ভীড়ের মধ্যে মিশে ছিল, সবই দেখেছে। ইউসুফ মুন্সি তাকে একবার অপমান করেছে কিন্তু তবুও সে মনে মনে মুন্সিকে শ্রদ্ধা করে। আজ যা ঘটেছে। সে কোনোমতেই মেনে নিতে পারেনি, আবার সাহসে কুলায়নি কিছু করার। রাতের আঁধারেই এসেছে তাকে মুক্ত করতে। ঠোটে আঙুল রেখে ইশারায় উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করলো বাচ্চু। ইউসুফের হাতে তখনো তার মেয়ের শাড়ি জড়িয়ে আছে। ইউসুফ মুন্সি বাচ্চুকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, তার আগেই বাচ্চু আরো একটি শাড়ি ইউসুফ মুন্সির হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দুনো কো লইয়া ভাইগ্যা যান।

ইউসুফ মুন্সি শাড়ি দুটি নিয়ে দুরু দুরু বুকে সেই ঘরের দরজা একটু ফাক করলো। ভেতরে এখনো ফাতেমা আর জুলেখা জেগে আছে। দরজা খুলতেই তারা নতুন আতঙ্কের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। ইউসুফ মুন্সি ভেতরে না ঢুকে শাড়িগুলো ভেতরে ছুড়ে বলল, 'পইরা বাইর হইয়া আসো।

ফজর আলী বাচ্চুকে বলল, আমার বউরে নাকি ধইরা আনছে, লগে আমার পোলাড়াও আছিল। বাচ্চু ভাই তুমি কিছু করো।'

বাচ্চু বিরক্ত হয়ে গেল, 'বাঙালি কি খাসালত খারাপ, বইতে দিলে শুইতে চাতা হায়। নিজের জান লইয়া ভাগ যাও। বিবি কা চিন্তা বাদ দেও। ও তোমারা বিবি নেহী হায়। যুদ্ধের ছময় পাকিস্তানি আদমী কা বিবি হ্যায়।'

ফজর আলীর মাথায় কী যেন হলো, কোথা থেকে যে তার মধ্যে এক বুক সাহস চলে এলো সে জানে না। বাচ্চুর খাকী শার্টের কলারটা দুই হাতে জোরে চেপে ধরে বলল, “শালার ব্যাটা পাঞ্জাবীগো দালাল, গলা টিপ দিয়া জিবলা বাইর কইরা ফেলমু। তর পাঞ্জাবী

বাপগো এহন ডাকতেও পারবি না। ডাকলেও মরবি। যা কইছি কর, আমার বউ পোলারে না লইয়া আমি যামু না।'

বাচ্চু বিস্ফোরিত নেত্রে ফজরের দিকে তাকিয়ে রইলো, এ কোন ফজর? এই ফজরের চোখের দিকে তাকালেই ভয় করে। বাচ্চুর কলার চেপে ধরাতে সে ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। কোনোমতে মাথা কাত করে সম্মতি জানালো সে, ফজর কলার ছাড়তেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো বাচ্চু। ফজরকে সাহায্য করা ছাড়া তার কাছে আর কোনো উপায়ও নেই, তেমন সমস্যাও নেই। আজ যার পাহারা দেয়ার কথা ছিল সে তাড়ি খেয়ে নাক ডাকছে। ফজরকে ইশারায় আসতে বলে হাঁটতে লাগলো। একটা দোচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আন্দার দেখো, তোমার বিবি ইধার আছে।

ভেতরে গুটিসুটি হয়ে অনেকগুলো মেয়ে ভয়ার্ত চোখে বসে আছে। তাদের চেহারা ভালো দেখা যায় না। বার কয়েক চোখ ঘুরিয়েও ফজর আমেনাকে খুঁজে পেলো না। নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, "আমেনা নামে কেউ আছে এইহানে? লগে একটা বাচ্চাও আছিল পাঁচ বছরের।

কিন্তু কোনো জবাব এলো না। ফজর আবার জিজ্ঞাসা করলো, কিন্তু কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো উত্তর পেলো না। বের হওয়ার আগে শুধু বলল, 'আল্লায় তোমাগো দেকবো। একদিন সব শেষ হইবো।'

ফজর বাহিরে এসে বাচ্চুকে বলল, "এইহানে নাই।

বাচ্চু মাথা নিচু করে অপরাধীর ভঙ্গিতে কয়েকটা উঁচু মাটির ঢিবি দেখিয়ে বলল, "তাইলে উধার আছে।'

ফজর আলী ভাবতেই পারছে না, আমেনা এই মাটির নিচে শুয়ে আছে। মজিদও কি শুয়ে আছে? মজিদের ছোটো ছোটো আঙুল কি পোকামাকড়ে কামড়ে খাচ্ছে। মজিদ মৃত্যুর সময় নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। পানি খেতে চেয়েছিল হয়তো। ফজরের পৃথিবীটা টলে উঠলো। জীবনে আমেনাকে সুখ দিতে পারেনি ফজর, মরণেও পারলো না। নিজেকেই দায়ী মনে হলো তার। ইচ্ছা করছে একটা ছুরি দিয়ে

গলাটা দুভাগ করে ফেলে। কিন্তু পরমূহুর্তেই ভাবলো মরলে তার অপরাধের শাস্তি হবে না। বুকের ভেতর আগ্নেয়গিরি নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে, জ্বলতে হবে সে আগুনে। মনের এক কোণে এখনো বৃষ্টির আশা করে সে। সব মিথ্যা হয়ে যাক। তার আমেনা, মজিদ ফিরে আসুক। তার নতুন জীবন হোক, তারা নতুন পরিচয় পাক। কেউ তাদের চোরের বউ, চোরের ছেলে বলে আর অবজ্ঞা করবে না, গঞ্জনা সহ্য করতে হবে না আর। একবার সে জ্বালা মেটানো বৃষ্টিটা আসুক।

ইউসুফ আলীর অস্ফুট চিৎকার শোনে সম্বিৎ ফিরলো ফজরের। বাচ্চু আগে আগে ছুটছে, কেউ জেগে গেলে তার নিজের জীবন বিপর্যয়ে পড়বে। ইউসুফ মুন্সি দুই হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছে। ফজর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কী হইছে?'

ইউসুফ মুন্সি মাথা তুলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তারা বাইচা গেছে।'

ফজর আলী বুঝে উঠতে পারলো না, সে উঠে সেই ঘরের ফাক করা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকালো। দেখেই আঁতকে উঠলো। একটি শাড়ি নিচে অবহেলায় পড়ে আছে, আরেকটি শাড়ির দুই প্রান্তে দুটো নগ্ন লাশ ঝুলছে। একটি ফাতেমার আরেকটি জুলেখার। মরেছে তারা আরো আগে, আজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো।

'ইউসুফ ভাই চলেন। ফজর দৃঢ় গলায় বলল।

ইউসুফ মুন্সি শূন্যে চোখ মেলে বলল, কই যামু, আমি এইখানেই মরুম।

'মরলে মরেন কিন্তু মরণের আগে কয়ড়া পাঞ্জাবী মাইরা হের পরে মইরেন।'

ইউসুফ মুন্সি উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো। ফজর যেন কেমন হয়ে গেছে, তার চোখেও আগের সেই নরম, অসহায় ভাবটা নেই। চোখে কী। অসম্ভব তেজ, অন্ধকার রাত্রীতেও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তার ভেতরে এতো আগুন তো আগে ছিল না। ইউসুফ মুন্সি সে আগুন কিছুটা নিজের মধ্যে জ্বালিয়ে নিলো। তারপর বলল, কই যাবি চল।'

'নালিন্দাবাড়ি যামু।'

ইউসুফ মুন্সি বাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুইও চল আমাগো লগে, তারা জানলে তোরেও মাইরা ফেলবো।'

বাচ্চুর শরীরে বাঙালি রক্ত কিন্তু মনে এখনো পাকিস্তানি মোহ প্রবাহিত হচ্ছে। সেই মোহেই মুন্সির প্রস্তাবকে তুচ্ছজ্ঞান করে হেসে বলল, 'হামকো কিউ মারেংগে? হাম উনকা আপনা আদমী হ্যায়।'

ইউসুফ মুন্সি চোখে অসম্ভব মায়া নিয়ে বলল, 'তুই জীবনেও পাকিস্তানি হইতে পারবি নারে। তোর মনে অহনো এটু হইলেও মায়া আছে। তোর ভিত্রে এহনো একটা বাঙালি আছে।'

***

ইউসুফ আলী অনেক ভুল কথা বলে কিন্তু বাচ্চুর ভবিষ্যত বাণী ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গাছের নিচটা ফাঁকা দেখে সে খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখলো দুটো নারী ফাঁস দিয়ে মরেছে তখন হতাশাটা রাগে পরিণত হলো। উত্তেজনাময় সকালটা বিবর্ণ হয়ে গেল। বাচ্চু নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে। অতি বুদ্ধির নমুনা দেখাতে গিয়েই সে ধরা খেলো। অতিরিক্ত একটা শাড়ির উৎস সম্পর্কে খোঁজ নিতেই তার নাম উঠে এলো। এবং সকালের রং ফিরে এলো। বাচ্চুকে নগ্ন করে পেটানো হচ্ছে। হাত পায়ের হাড়ের পাশাপাশি তার আত্মবিশ্বাস এবং পাকিস্তানিদের প্রতি বিশ্বাস সব ভেঙ্গে গেল। পাঞ্জাবীদের তোষণ করা মনে বিষ জমলো। নিজের ভেতরের বাঙালিটা জেগে উঠলো ব্যথা পেলেই যে মাগো' বলে কেঁদে উঠে। মরার আগে শেষ যে বাক্যটি তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তা হলো, শালা পাকিস্তানি শুয়োরের বাচ্চা

১৫

সেদিন রাতে কালীগাঙ্গের পাড় ধরে হাঁটছে ফজর আর ইউসুফ। তিন দিন ধরে এই দুপায়ের উপর কম অত্যাচার হয়নি। কখনো হেঁটেছে, কখনো কাটা ভরা জঙ্গলে দৌড়েছে। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, কিন্তু থামতে পারছে না তারা। লুঙ্গি কাছা মেরে মাথায় গামছে বেঁধে নিয়েছে। শপথ নিয়েছে মনে, একটা পাঞ্জাবী না মেরে মরবে না।

'কেডা? কেডা যায়?

একটা লোক এগিয়ে এলো, কালো শরীরটা রাতের আঁধারের সাথে যেন দ্রবীভূত হয়ে গেছে, তাই লোকটাকে তারা দেখেনি। কাছে আসতেই লোকটাকে চিনলো ফজর আলী। নসু মাঝি। কিন্তু অন্ধকারে ফজর আলীকে চিনেনি নসু, কতো মানুষকে পার করে নসু সবার চেহারার সাথে নাম মনে করতে পারে না, ফজরের মুখে পেঁচিয়ে উঠা এবড়ো থেবড়ো দাড়ির কারণেও হয়তো চিনতে পারেনি। ফজর নিজের পরিচয় দিলো না, দেয়ার মতো তেমন কোনো পরিচয়ও তার ছিল না। তার বর্তমান পরিচয় জেলা পালানো আসামী, অতীত পরিচয় তেইল্যা চোরা। কোনটিতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই, এবং ভীষণ মর্যাদাহীন। ফজর আলী মুখটা খানিক ঢেকে বলল, 'আমরা নালিন্দাবাড়ি যামু।'

নসু বলল, 'বডার পার হইবেন? আসেন আমার নাও আছে। আমি মানুষ পার করি।

ইউসুফ মুন্সি উশখুশ করে বলল, 'পয়সা নাই আমাগো কাছে।

'আরে কী কন, এই বিপদের সময় পয়সা নিমু নাকি? শইলডা জুইলা যায় যহন কাউরে পার করতে পারি না। আপনাগো পার করতে পারলে আমার ভাল লাগবো।'

নদীর ছলছল শব্দ ছাড়া আর তেমন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না, দূরে হঠাৎ হঠাৎ একটা শিয়াল আনন্দে ডেকে উঠছে, কবর খুড়ে লাশ বের করে খেতে হয় না আর তাদের। মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, মানুষ এখন ফিসফাস করে কথা বলে, তারা নীরবে কাঁদতে শিখে গেছে।

নৌকা কালীগাঙের বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে, নসুর বৈঠা একটা অপরূপ ছন্দ তৈরি করেছে নদীর তালে। ফজর বসে আছে, তার ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরটি এলিয়ে পড়তে চাইছে। ইউসুফ মুন্সি নৌকার মাঝ বরাবর শুয়ে পড়ল। আকাশের তারাগুলো দুলছে মনে হচ্ছে। একসময় ঝাপসা হয়ে এলো তারাগুলো। মুন্সি ঘুমিয়ে পড়েছে। ফজর ঘুমায়নি, গত কয়েক বছরের জীবনটা এই অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা দিলো তার চোখের সামনে। নিজেকে আজ নিজেই চিনতে পারছে না সে। একসময়ের ভীত অসহায় ফজর মরে গেছে, এখন যে নৌকার গলুইয়ে বসে আছে সে ফজর নয় সে অন্য কেউ। তার কোনো আপনজন নেই, কিন্তু জ্বালা আছে। তার কোনো ভয় নেই কিন্তু ক্রোধ আছে।

'ভাই, ও ভাই।' | নিজের চিন্তায় অচেতন হয়ে গিয়েছিল ফজর। নসুর ডাকে চেতনা ফিরলো, নসু তাকে ডাকছে ফিসফিস করে।

'কী হইছে? আইয়া পড়ছি?

নসু একটা বৈঠা ফজরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "হাত লাগান একটু তয় আওয়াজ যেন না হয়। পাঞ্জাবীরা মনে হয় রাইতেও পাহারা বসাইছে। তাড়াতাড়ি পার হইতে হইবো এই জায়গাডা।

ফজর নৌকার গলুইয়ে বসে বৈঠা বসিয়ে দিলো নদীর বুকে। অনভিজ্ঞ হাতে বৈঠা চালাচ্ছে সে, নদীর সাথে তাল মেলাতে পারছে না। দূরে কোথাও মানুষের শব্দ পাওয়া গেল। বুক শুকিয়ে গেল দুজনের। নৌকার গতি আরো বাড়ালো কিন্তু সময়ের গতি যেন কমে গেল। মানুষের গলা ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ আলো পড়ল তাদের উপর, একটা পাঞ্জাবী গলা ভেসে এলো, 'কৌন যাতা হ্যায়?

নসু এবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ফজরকে বলল, "ভাই জান দিয়া টানেন।'

মুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলে গেল, যন্ত্রের মতো দাড় বাইছে দুজন। আলোটা এখনো সরেনি তাদের উপর থেকে। সাথে সাথেই একটা বন্দুক আর্তনাদ করে গুলি ছুড়লো। ইউসুফ মুন্সি ধরফর করে উঠে বসলো, কী হচেছ কিছুই বুঝতে পারছে না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চারপাশে দেখছে। নসুর পেশী ফুলে উঠেছে, নৌকা কলকল করে ছুটে চলেছে। ফজর

সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা চালাচ্ছে। তার আর কোনো হুশ নেই, পরপর কয়েকটা গুলি চলল। আলোটা এখন আর তাদের উপর নেই, কিন্তু গুলি থামেনি এখনো। ফজর চোখ বন্ধ করে দাড় টানছে। বুকের ধরফরানি যেন বন্দুকের শব্দকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। পানির ছটায় পুরো ভিজে গেছে। ফজর। হৃতপিন্ডটা যেন মুখের কাছে চলে এসেছে, কতক্ষণ এভাবে দাড় বেয়েছে বলতে পারবে না ফজর। এক মিনিটও হতে পারে আবার এক ঘণ্টা হলেও অবাক হবে না। গুলির শব্দ থেমে গিয়েছে। ফজর হা করে দম নিচ্ছে। পেছনে ফিরতে ফিরতে নসুকে বলল, "আজরাইলের হাত থেইক্যা বাঁইচা গেলাম।'

কিন্তু কই নসু? সে তো একা। ফজর চমকে উঠলো। ডিঙ্গির পেছনে গিয়ে জরিপ করলো, ইউসুফ মুন্সি এখনো বিমূঢ় হয়ে বসে আছে মাঝে। নসুর চিহ্নমাত্র নেই। দূরে নদীতে পাঞ্জাবীরা আলো ফেলে রেখেছে, সেখানে কালোমতোন একটা জিনিস ভাসছে। কালো শরীরের নসু, কালী গাঙের বুকেই সারাজীবন কাটিয়েছে, আজ সেই কালী গাঙেই তার সমাধি হলো।

রাতের গভীরতা মাপার মতো বিবেচনা ফজরের নেই এখন। নদীর। ধারেই একটা গ্রামে এসে পৌছালো তারা, নদীতে পুজার লাল জবা ফুল আর ধুপের গন্ধে আন্দাজ করে নিলো, এটাই নালিন্দাবাড়ি গ্রাম। এই এলাকায় নদীর পাড়ে হিন্দু গ্রাম বলতে এই একটাই। ফজর নৌকা ঘাটে ভিড়ালো, আরো কিছু ডিঙ্গি বাঁধা আছে এখানে। গ্রামটা এখনো ঘুমায়নি, তবে ঝিমাচ্ছে। টিম টিম করে জ্বলা কিছু আলো চোখে পড়ছে। নিশি জাগা কিছু বাচ্চারা অভ্যাসমতো কাদছে। ফজর তার ভেজা শরীরটা টানতে টানতে নিয়ে চলল সেই আলোর দিকে সাথে ইউসুফ মুন্সি। একটা ঘুমন্ত বাড়ি পেরুতেই আলোর সন্ধান পেলো। উঠানের কোণে হারিকেন জ্বলছে, তার নিচে কিছু মানুষ গুটিসুটি মেরে পড়ে রয়েছে। হারিকেনের আলোটা চোখে সয়ে এলে, ফজরের ভুল ভাঙ্গলো, পুরো উঠান জুড়ে শখানেক মানুষ রয়েছে। কেউ কেউ জেগে রয়েছে, কেউ আবার নাক টেনে চুপিসারে কাঁদছে, বাকিরা কোনোমতে চোখ বন্ধ করে পড়ে রয়েছে। কেউই আগন্তুকের আগমনে বিচলিত হলো না। ফজর চোখ দুটো বুলিয়ে নিচ্ছে সবার উপর, পাঁচ বছরের বাচ্চা

দেখলেই বুকটা কেঁপে উঠছে তার, অন্ধকারে সবাইকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। একজন বৃদ্ধ তাদের দেখে মুখ ভ্যাংচালো। অন্যদিকে তাকিয়ে স্বগোক্তি করলো, 'বেবাক মানুষ আইছে, নৌকাত জায়গা পাইতাম না। সব ভাগতাছে দেশ ছাইড়া। এতো মানুষ ক্যামনে থাকবো, কী খাইবো?'

কথাগুলো যে তাদের উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে তা বুঝতে ইউসুফ আর ফজরের বেগ পেতে হলো না। এসব মানুষ সব রিফিউজি ক্যাম্পে যাবার অপেক্ষায় আছে। প্রতিদিন নৌকা আসে। নৌকায় প্রায়শই স্থান সংকুলান হয় না। এখানের হিন্দু বাড়ির মানুষগুলো উঠানে তাদের জায়গা করে দিয়েছে। ভাত না পারলেও চাল ভাজা খেতে দিচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটি শুধু ফজর আর ইউসুফের উপর বিরক্ত নয়, সে দুনিয়ার যাবতীয় সকল প্রাণির উপর বিরক্ত। মশা কামড় দিলে চেঁচিয়ে উঠে, গরম লাগলে ধমকে উঠে, কাকে ধমকায় সে-ই ভালো জানে। আশেপাশের লোকজনের তো কাছে ঘেষার বালাই নেই, তার চোখে চোখ রাখলেই দুটো কথা শুনিয়ে দেয়। ফজর আলী আর ইউসুফ মুন্সি উঠানের এক কোণে আশ্রয় নিলো।

বাড়ির কর্তা এলো চালভাজা বিতরণ করতে। নতুন অতিথি দেখেই বলল, 'আপনেরা বডার পার হইবেন?

'না, আমরা মুক্তি ক্যাম্পে যামু।'

খালি গায়ের পৈতা পরা লোকটির চোখে সন্ত্রম ফুটে উঠলো। তাদের হাতে মুঠো মুঠো চালভাজা গুঁজে দিলো, একটু বেশিই দিলো। বলল, "আইজকা রাইতটা এইখানে থাকেন। কাইল সকালে আমি রাস্তা চিনাইয়া দিমু।'

লোকটি সবাইকে এক মুঠো করে চাল ভাজা দিলো। বুড়ো লোকটির আবার অভিযোগ শুরু করলো। চালভাজার কাঠিন্য নিয়ে তার সমস্যা হচ্ছে। এই খাবার গরু ছাগলের মুখেও নাকি রুচবে না বলে নিতান্ত অনিচ্ছায় চাবাতে লাগলো। কেউ কিছু বলছে না, সবার মুখ ব্যস্ত। ফজর পাশের ঝিমাতে থাকা লোকটাকে বলল, এই বুড়া মিয়া কি কোনো জমিদার নাকি?'

পাশের লোকটি হেসে বলল, "আরে না, ওর নাম নেকু ফকির। ভিক্ষা কইরা খায়, তয় জমিদারের থেইকা কমও না।'

যুদ্ধের সময় দুনিয়াটা অদ্ভুত হয়ে যায়। জমিদাররা সব ভিক্ষুক হয়ে গেছে, ভিক্ষুকরা সব জমিদারি ভান ধরেছে। ইঁদুররা সব রাজাকার হয়ে পিঠে রাইফেল নিয়ে সিংহ হয়ে গেছে। তাদের বুক আছে সে বুকে সাহস নেই। তাদের জিহ্বা আছে, সে জিহ্বায় লোভের লালা ঝরে পড়ে। একজন সিঁদ কাটা চোরও মুক্তিযোদ্ধা হবে, কেন হবে? প্রতিশোধ কিংবা ঘৃণার জন্য অথবা নতুন পরিচয়ের জন্য। রাইফেল ছাড়াও সে যোদ্ধা, তার বুকে আগুন আছে।

সকালটা আবার কোলাহলে শুরু হলো। নদীতে নৌকা ভিড়েছে। মানুষজন হুড়মুড় করে উঠছে নৌকায়। দেখলে মনে হবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে পালাতে চাইছে। দেশ ত্যাগে তাদের আগ্রহ নেই কিন্তু তবুও পালাচ্ছে, মৃত্যুর ভয়ে। অনেকেই নৌকায় উঠে কেঁদে ফেলেছে, আবার কি ফিরে আসতে পারবে বাপ দাদার ভিটায়? এই মায়া ভরা মাটিতে?

সব কান্না ছাপিয়ে একটা কান্না ফজরের ভেতরটা নাড়িয়ে দিলো। এই কান্না তার অতিপরিচিত। মাস্টারপুত্রের বেতের আঘাতে মজিদ ঠিক এভাবেই কেঁদেছিল। ফজরের দৃষ্টি চঞ্চল ফিঙ্গের মতো ঘুরতে থাকলো। কে কাদছে এভাবে? বাচ্চাটাকে একবার বুকে ভরে নেবে। মজিদের জন্য জমিয়ে রাখা সব আদর উজার করে দেবে। শব্দটাকে অনুসরণ করতে করতে নৌকার কাছে চলে এলো ফজর।

মাঝেমধ্যে কিছু ঘটনা প্রমাণ করে দেয় মানুষের কল্পনা অসীম নয়। ফজর যা কখনো কল্পনা করেনি, তাই ঘটলো। এই মুহূর্তে ফজরের মনের অনুভূতি লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নৌকায় ক্রন্দনরত মুখটি যে তার মজিদের। যার চেহারাটা, যার মুখাবয়বটা মনে করার জন্য কত নিদ্রাহীন রজনী ছটফট করে, চোখের জল ফেলে কাটিয়েছে সে মজিদ তার মায়ের কোলে বসে কাদছে। আমেনা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, নিশ্চিতভাবেই সে তার চোখকে বিশ্বাস করছে না। এই অদ্ভুত মিলন প্রকৃতি তাদের জন্য ঠিক করে রেখেছিল। ফজরও নিজের চোখকে সন্দহ করছে, বিশেষ করে যখন দেখলো আমেনা হুরমতির কাধে মাথা রেখে বসে আছে। মজিদ তার বাজানের দাড়ি সমৃদ্ধ চেহারাটা চিনতে পারেনি প্রথমে,

যখন চিনেছে তখন তার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। মায়ের কোল ছেড়ে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে বাজানের কোলে ঝাপিয়ে পড়ল মজিদ। ফজর নিজের গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে মজিদকে জড়িয়ে ধরেছে। একটুর জন্যও ছাড়ছে না, এখনো তার মনে সন্দেহ হচ্ছে সে স্বপ্ন দেখছে। মজিদকে ছেড়ে দিলেই স্বপ্নটা ভেঙ্গে যাবে।

হুরমতি চোখে জল এলো, রোশনী আঁচলে চোখ মুছলো। তরিকত মোল্লাও মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকালো। কিন্তু আমেনার চোখ এখনো মরুভূমি। ফজরকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। ছেলের গায়ে শপথ করেছিল। ছেলের অনিষ্টের চিন্তা না করে সে শপথ ভেঙ্গেছিল। ফজর মজিদকে জড়িয়ে রেখেই চোখ মেলে আমেনার দিকে তাকালো। আমেনা একটু চমকে উঠলো, এই দৃষ্টি তো সে আগে দেখেনি। কেমন খাঁটি আর পবিত্র সে চোখ। একেবারে কোনো বাধা ছাড়া বুকের ভেতরে গিয়ে অভিমান, অভিযোগের সব জাল ছিন্ন করে দেয়। ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা করে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না আমেনা, অভিমান সরে যেতেই লজ্জা ভর করে। ফজর কাছে এগিয়ে আসে, বলে, “আমি তো ভাবছিলাম...।'

আটকে যায় সে আর বলতে পারে না। হুরমতির মায়াময় চেহারাটা দেখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সাথে আরো একটি মেয়ে। কে এই মেয়ে? অনেক কিছুই জানে না ফজর। জানতেও চায় না, কিন্তু তরিকত মোল্লা উৎসাহ নিয়ে সব বলল।

***

কলিম বেপারীর পাঠানো দুটি রাজাকার খুব আনন্দ নিয়ে আমেনা আর রোশনীকে নিয়ে টানাটানি করছিল। হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল বুঝা গেল না, আমেনা শুধু একটা রক্তের ধারা ছুটতে দেখলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা, চিকন লোকটি একটি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। হুরমতি দাঁড়িয়ে আছে পেছনে, তার হাতে রক্তাক্ত দা। তার মুখে অপরিসীম হিংস্রতা। পেটমোটা লোকটি ভীত শুকরের মতো অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে হুরমতির রুদ্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। তার মনে যত সাহস ছিল, সবই পিঠের রাইফেলের জোরে। কিন্তু হুরমতিকে দেখে সেই রাইফেলের কথাই যেন ভুলে গেল। রোশনীর হাত

ছেড়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালালো সে। পেছন থেকে হুরমতি গালি বর্ষণ করছে, ‘গোলামের পুতেরা মাইয়া দেখলেই জিবলা বাইর হইয়া যায়? লেড় খাওয়া বলদেরা সাহস থাকলে আয়, কল্লাটা নামায়া দেই। ঐ পেটলাগানীর পুত ভাগস কই?'

গালিগুলো যদি আগেই ব্যবহার করতো হয়তো দায়ের প্রয়োজন পরতো না। আমেনা এবং রোশনী দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ক। হুরমতির হিংস্র, কদর্য মুখটার পেছনে একটা মায়ের কোমল ছবি আছে, কিন্তু হুরমতি মা হতে পারেনি। হুরমতির ভয়েই তরিকত মোল্লা দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। সন্তানের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করে প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে সন্তানহীন থাকাই উত্তম মনে করেছে সে। হুরমতি সারা দুনিয়াকে অভিশাপ দিয়ে বেড়ায়। সে, আমেনাকে একটু বেশিই দেয়, আমেনার প্রতি হিংসাও তার কম নয়, আমেনা মা, সে নয়। আমেনা হুরমতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমারে বাঁচান নাই আমার পোলার মারে বাঁচাইছেন।' বলেই হুরমতির পায়ে ঢলে পড়ল। পায়ে ধরে বলল, ‘আইজ থেইকা আমার পোলার দুইডা মা।'

আশ্চর্যজনকভাবে হুরমতির হিংস্র চেহারাটা মুহূর্তেই মুছে গেল। সেখানে ভর করলো মায়া ভরা এক মুখ। আমেনাকে ধরে উঠিয়ে স্বভাবমতো বলল, “ধুর মাগী, আর ঢং করিস না।

হুরমতির গালিতে আমেনা আর বিচলিত হলো না, এই গালিতে কতো মায়া ভরা আছে সে এখন জানে। তরিকত মোল্লা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ খেয়াল করেনি। রাজাকারের পোশাক পরা একটা রক্তাক্ত লাশ উঠানে পড়ে আছে, যাওয়ালা একটা কুকুর লাশটাকে ঘুরে ঘুরে শুকছে। হুরমতি দাওয়ায় আমেনা আর রোশনীর সাথে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটা রক্তমাখা দা। তরিকত মোল্লার অজ্ঞান হওয়ার দশা। তরিকত মোল্লাও রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই খবর ক্যাম্পে পৌছালে কী হবে খুব ভালো করে জানা আছে তার। সে কাছে গিয়ে বলল, এইডা কী করলা বউ, আমরার মরণের ব্যবস্থা করলা?’

হুরমতি চেঁচিয়ে বলল, তুমি কেমুন পুরুষ গো, দুইডা মাইয়ারে ধইরা নিয়া যাইতাছে আর তুমি ঘরে শুইয়া ঘুমের ভান ধইরা পইরা আছিলা। ভিত্রে ভিত্রে যে তুমি হিজড়া হেইডা তো আগে জানি নাই।'

হুরমতির সাথে বিতণ্ডাতে যাওয়াই উচিত হয় নাই তরিকত মোল্লার, কথার ঘায়ে সে হাজার সৈন্য কুপোকাত করতে পারে, তরিকত তো সাধারণ মোল্লা মানুষ। সে কথার সুর পরিবর্তন করে বলল, এহন গাট্টি বোচকা যা পারো তাড়াতাড়ি বান্ধো, এইখানে আর থাকন যাইবো। পালাইতে হইবো।' হুরমতি বলল, কই যামু?' রোশনী বলল, 'নসু মাঝি কইছিল, নাও দিয়া নালিন্দাবাড়ি নামাইয়া দিবো।'

হুরমতি কোমর দোলা দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, 'যদিও ধরে বাঘে, ভাতারের নামডাই আগে।'

নসু মাঝি তাদের নামিয়ে দিয়ে গেছে। রোশনী বলেছিল তাদের সাথে যেতে, কিন্তু নসু রাজি হয়নি। সে অবাক হয়ে বলেছিল, "কী কও কুটুম, আরো কত মানুরে পার করতে হইবো, আমি না থাকলে মাইনষে এই বিপদে গাঙ পার হইবো ক্যামনে।'

রোশনীর মন খারাপ হয় আবার খুব গর্বও হয়, মনে মনে ছড়া কাটে সে,

'তুমি খুব ভালা গো মাঝি তুমি খুব ভালা।

এইবার আসলে তোমারে দিমু, ভালোবাসার মালা।

***

মজিদ ফজরের কোলে বসে আছে। কাদা থেকে মজিদের ঘোড়াটি উদ্ধার করে দিয়েছে ফজর। তার কান্নার হেতুই ছিল এই ঘোড়া। নৌকায় উঠার সময় তার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াতে আর তেমন আগ্রহ নেই তার, সে তার বাজানকে পেয়েছে। ইউসুফ মুন্সির খুব আনন্দ। নিজের কষ্ট ভুলে ফজরের সুখ দেখেই তার বুক আনন্দে ভরে গেছে। তরিকত মোল্লার সব কথা শোনার পর ফজর আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নসু মাঝি আসলেই ভালা লোক আছিল।'

ফজরের দীর্ঘশ্বাস আর অতীতকালে করা স্তুতিবাক্য শুনে রোশনী উৎকণ্ঠ হয়ে বলল, “কই? মাঝি কই?

‘আওনের সময় মিলিটারিরা গুলি চালাইছিল আমাগো উপ্রে। নসু গুলি খাইয়া গাঙে ডুবছে।'

সাথে সাথে রোশনী হাঁটু ভেঙ্গে বসে গেল, দিনের চকচকে আলোতে অন্ধকার নেমে এলো তার চোখের সামনে। মূর্ছা যাওয়ার আগে বলল, 'আমি বড়ো আভাগী, কপাল পোড়া।'

নৌকায় লোকজন নিজেদের আসন দখল করছে। ফজর আমেনাকে তাগিদ দিলো। রোশনীকে ধরাধরি করে নৌকায় উঠানো হলো। আমেনা উঠলো, ফজর মজিদকে কোলে তুলে উঠিয়ে দিলো। ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠলো, “তেইল্যা চোরা না? জেল থেইক্যা কবে আইলো?'

আমেনার মুখটা মলিন হয়ে গেল। ফজর দাড়িয়ে রইলো। আমেনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আসো, নাও ছাইড়া দিবো।'

‘আমি যামু না বউ, তোমারা যাও। মজিদরে দেইখা রাইখো। যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরা আইসো। আমি না থাকলেও মজিদরে লেখাপড়া করাইও। পফেসর বানাইও। কদম গাছ দুইডা কোন সুমায় কাইটো না।'

আমেনা অবাক চোখে চেয়ে রইলো ফজরের দিকে। বলল, “কই যাইবা তুমি?'

‘আমি মুক্তিক্যাম্পে যামু, আমার যুদ্ধ শেষ অয় নাই।

ভেতর থেকে অনেকগুলো সভ্রমের দৃষ্টি ফজরের দিকে তাকালো। ‘তেইল্যা চোরা’ বলা লোকটি লজ্জায় মিইয়ে গেল। তার সাহস নেই যুদ্ধ করার তাই সাহসী বীরের সামনে লজ্জায় মাথা নত করাই কর্তব্য মনে করলো। ফজর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, আমেনার দুই গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এসেছে। এই প্রথম আমেনাকে কাঁদতে দেখলো সে। আমেনার বুকে হাজারটা কথা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার কাঠিন্যের মুখোশ চোখের জলে গলে গলে পড়ছে। আমেনা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, ‘এই যুদ্ধ কি শেষ অইবো?'

'অইবো বউ, আমরা শেষ করুম। মজিদ নিজের ভিটায় থাকবো। বুক ফুলাইয়া হাটবোর তারে কেউ চোরের পোলা কইবো না, মুক্তির পোলা কইবো।' বলতে বলতেই সুখস্বপ্নে ফজরের চোখ ভিজে উঠে।

নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, আমেনা এখনো অশ্রুসজল চোখে ফজরের দিকে তাকিয়ে আছে। মাকে কাঁদতে দেখে মজিদও কাঁদতে থাকলো, এই দৃশ্য তার কাছে নতুন। হুরমতি মজিদকে আঁকড়ে ধরে বলল, আরে ব্যাটা তুই কান্দিস না, তুই মুক্তিযোদ্ধার পোলা।'

রোশনী স্থির চোখে তাকিয়ে আছে, তার চোখে এক ফোটা জলও নেই। তার সব কান্না শুকিয়েছে। পাশে বসেই আমেনা পাড়ের দিকে তাকিয়ে শুধু কেঁদেই চলেছে, তার অনেক বছরের কান্না জমা আছে। প্রকৃতি সাম্যবস্থার নীতিতে চলে, একজন কাদার ক্ষমতা হারালো আরেকজন ফিরে পেলো।

নৌকাটা মোহনায় আড়াল হওয়ার আগ পর্যন্ত ফজর তাকিয়ে ছিল। ফজর আর ইউসুফ মুন্সি হেঁটে চলল নালিন্দাবাড়ি মুক্তিক্যাম্পের দিকে।

***

ফজরের আরেকটা প্রতিজ্ঞা পূরণ করা বাকি। নিজের ছেলের কসম কেটে যে প্রতিজ্ঞা সে সুজনের কাছে করেছিল।

নালিন্দাবাড়ি মুক্তিক্যাম্পের কমান্ডারের সামনে দাড়িয়ে আছে ফজর পাশে ইউসুফ মুন্সি। কমান্ডার সিগারেটে ফুঁ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করছেন। বললেন, 'মুক্তি হইতে হলে জানের মায়া ছাড়তে হবে। পারবে?'

ফজর দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো, পারুম স্যার। মাথায় কাফন বানছি।'

'এইখানে খাবার দাবারের গ্যারান্টি নাই, ঘুমানোর জন্য সুন্দর বিছানা নেই। মাঠে-জঙ্গলে ঘুমাতে হবে। কোনো আরাম আয়েশের ব্যবস্থা নাই।'

'আরাম-আয়েশের দরকার নাই স্যার, আরাম-আয়েশ মাডি দিয়া আইছি। খালি কয়ডা পাঞ্জাবী মারতে পারলেই অহন আরাম হইবো।'

কমান্ডারের মুখে হাসি ফুটলো, বলল, "কী নাম তোমার?'

ফজর উপরের দিকে একবার তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিলো, ‘সুজন।।

পাশে দাঁড়ানো ইউসুফ মুন্সি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো ফজরের অটল মুখটার দিকে। নিজের নাম বিসর্জন দিয়ে সুজনের কাছে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলো ফজর।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। নালিন্দাবাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের বাহিরে দাড়িয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজছে ফজর। বহু প্রতীক্ষার বৃষ্টি, বুকের আগুন নেভাননা বৃষ্টি। বলরামপুরে মেঠোপথ থেকে যে দুটি কদম গাছ দেখে ফজরের বাড়ি চেনা যায় সে দুটি কদম গাছও ভিজছে। আজ তাদের বিষণ্ন লাগছে না।